১০ই নভেম্বর স্মরণে

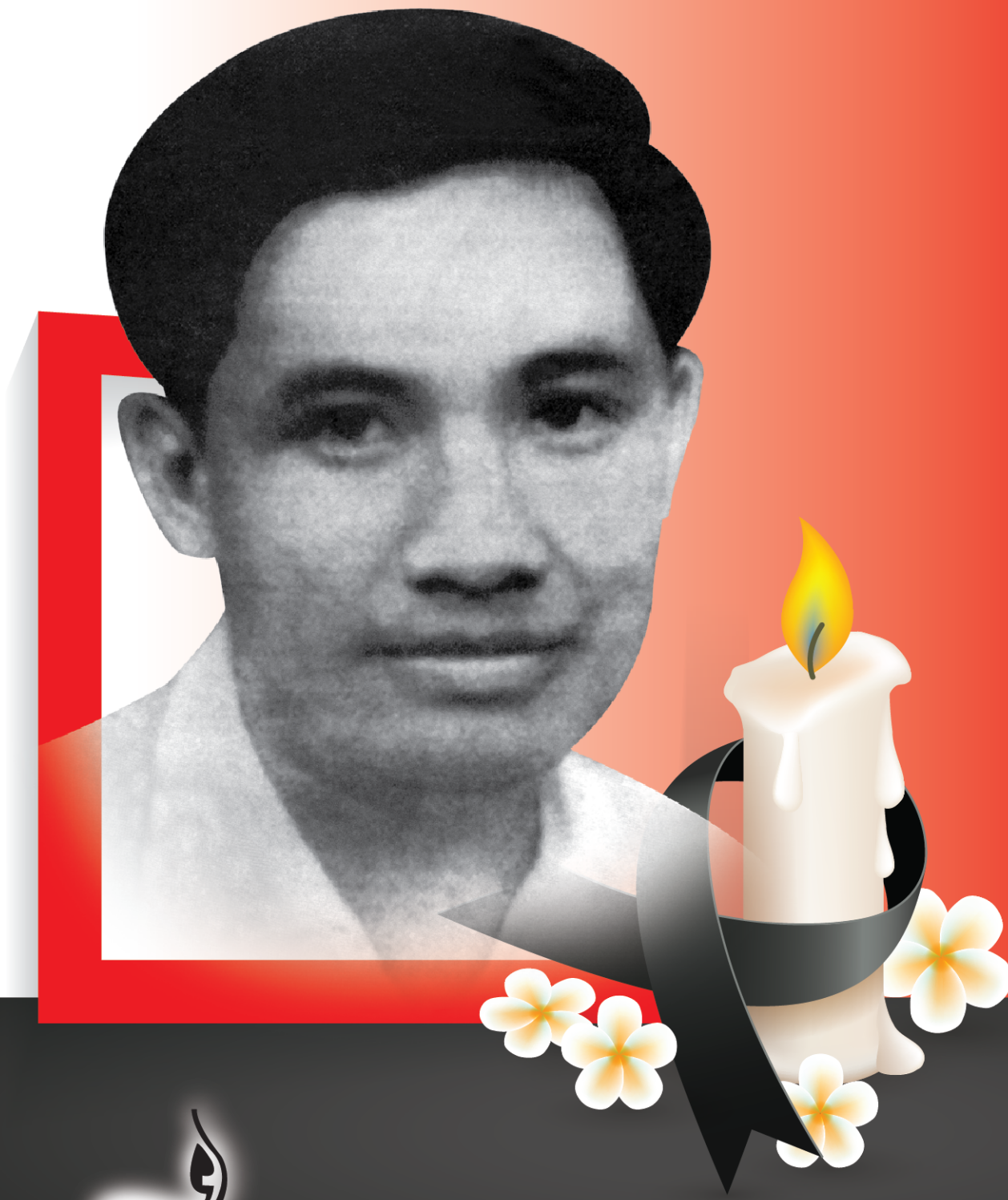

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

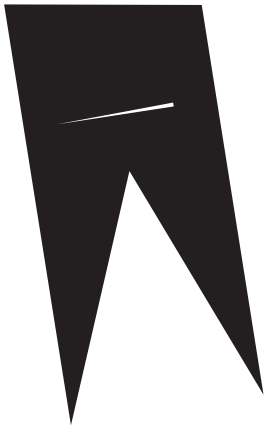

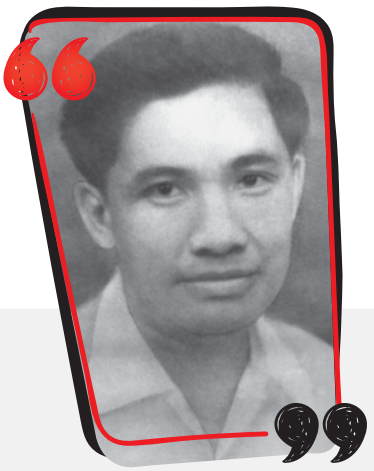

১০ই নভেম্বর স্মরণে

প্রকাশ:
১০ নভেম্বর ২০২২

প্রকাশনায়:
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি
ফোন: +৮৮-০২৩৩৩৩৭১৯২৭
ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com
ওয়েব: www.pcjss.org

শুভেচ্ছা মূল্য: ১০০ টাকা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়	০৪
প্রবন্ধ:	**০৬-৪৬**
এম এন লারমার সংগ্রাম ও তার প্রাসঙ্গিকতা – মিতুল চাকমা বিশাল	০৬
স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা – পাভেল পার্থ	১৩
পার্বত্য চুক্তি নিয়েতাত্ত্বিক ভাবনা : ফিরে দেখা বিগত ২৫ বছর – অনুরাগ চাকমা	১৮
অতীতের সংগ্রামের ইতিহাস আগামী প্রজন্মের পথচলার অন্যতম পাথেয় –বি সি চাকমা	২১
এম এন লারমার ঐতিহাসিক দায়িত্ব তরুণ সমাজকেই কাঁধে তুলে নিতে হবে মোনালিসা চাকমা	২৫
বিপ্লব-পিপাসু এক মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা – শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা	২৭
১০ নভেম্বর : জুম্ম ছাত্র-যুবদের এম এন লারমার চেতনায় জাগরণের দিন – বাচ্চু চাকমা	৩০
বান্দরবানে বন্দুকযুদ্ধ : আইএসপিআরের 'চোরের মায়ের বড় গলা' – প্রীতিবিন্দু চাকমা	৩৩
পার্বত্য চট্টগ্রামে শাসকগোষ্ঠীর শাসন ও রাজনীতি প্রসঙ্গে কিছু কথা – আবুমং মারমা	৩৬
কেবল রাজনৈতিক সমাধানেই পার্বত্যাঞ্চলে শান্তি ফিরবে – মঙ্গল কুমার চাকমা	৩৯
আগ্রাসনের করাল গ্রাসের মুখে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী! – সজীব চাকমা	৪১
কবিতা	**৪৭-৫০**
শোকাবহ ১০ নভেম্বর – সত্যবীর দেওয়ান	৪৭
প্রণাম তব – জ্যোতি প্রভা লারমা মিনু	৪৭
১০ নভেম্বর – তন্টু চাকমা হিমেল	৪৮
পাহাড়ের নিরব কান্না ভদ্রাদেবী তঞ্চঙ্গ্যা	৪৯
মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা – নলীন চাকমা	৫০
বিশেষ প্রতিবেদন	**৫১-৬৬**
প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর হয়রানি ও নির্যাতন	৫১
সেটেলারদের পার্বত্য চুক্তি বিরোধী তৎপরতা, ভূমি বেদখল ও নারীর উপর সহিংসতা	৫৩
প্রত্যাহৃত সেনা ক্যাম্পে এপিবিএন মোতায়েন পার্বত্য চুক্তির সরাসরি লঙ্ঘন	৫৬
রাষ্ট্রযন্ত্র-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপের তৎপরতা ও তথাকথিত 'ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত'	৬০
জাতিগত নির্মূলীকরণে সরকারের ডেভেলাপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং	৬৫
আন্তর্জাতিক সংবাদ	৬৭

সম্পাদকীয়

আজ ১০ই নভেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের গণপরিষদ সদস্য ও সাবেক সাংসদ, নিপীড়িত, নির্যাতিত ও অধিকারহারা জাতি ও মানুষের পরম বন্ধু, বিপ্লবী ও মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার (এম এন লারমা) ৩৯তম শাহদাৎ দিবস। ৩৯ বছর আগে ঠিক এই দিনে ১৯৮৩ সালের ১০ই নভেম্বর গভীর রাতে জাতীয় বিশ্বাসঘাতক, বিভেদপন্থী ও অপরিণামদর্শী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের অতর্কিত সশস্ত্র হামলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন জুম্ম জনগণের প্রাণের মানুষ, এদেশের নিপীড়িত মানুষের পরম বন্ধু, মহান এই বিপ্লবী নেতা এম এন লারমা। তাঁর এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে সমগ্র জুম্ম জাতিসহ বিশ্বের অধিকারকামী জনগণের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। এই জাতীয় শোকাবহ দিনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মহান নেতা এম এন লারমার অসামান্য ত্যাগ-তিতিক্ষা, সংগ্রাম ও অবদানের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে।

একই ঘটনায় এম এন লারমার সাথে আরও শহীদ হন তাঁরই বড় ভাই সহযোদ্ধা শুভেন্দু প্রবাস লারমা (তুফান), সহযোদ্ধা অপর্ণাচরণ চাকমা (সৈকত), অমর কান্তি চাকমা (মিশুক), পরিমল বিকাশ চাকমা (রিপন), মনিময় দেওয়ান (স্বাগত), কল্যাণময় খীসা (জুনি), সন্তোষময় চাকমা (সৌমিত্র) ও অর্জুন ত্রিপুরা (অর্জুন)। তাঁদের আত্মবলিদান জুম্ম জনগণ তথা দেশের নিপীড়িত, বঞ্চিত, অধিকারহারা ও গণতন্ত্রকামী মানুষ কোনোদিন ভুলবে না, ভুলতে পারে না। আজ এই ৩৯তম জাতীয় শোক দিবসে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তাঁদের এই মহান আত্মবলিদান সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছে।

দীর্ঘ দিনের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে নানাভাবে অংশগ্রহণ করার কারণে অনেক কর্মী ও সংগ্রামী ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন কারাগারে অন্তরীণ হয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন। অসংখ্য নারী ও শিশু পাশবিক ও নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়ে দুর্বিষহ জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। আজকের এই শোকাবহ দিনে জনসংহতি সমিতি তাঁদের এই অমূল্য ত্যাগ ও অবদান সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছে এবং সকল শহীদ, বন্দী, পঙ্গু কর্মী ও ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছে।

মহান নেতা এম এন লারমার সূচিত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের ফসল হলো ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এই চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের অঙ্গীকার করলেও চুক্তিতে সন্নিবেশিত পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বশাসনব্যবস্থা কায়েম, সেনা শাসনসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি পূর্বক জুম্মদের বেহাত হওয়া জায়গা-জমি ফেরত দান, বহিরাগতদের নিকট প্রদত্ত ভূমি লীজ বাতিল, ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও

আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের স্ব স্ব জায়গা-জমিতে পুনর্বাসন, মুসলিম সেটেলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেনি। বরঞ্চ পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর যতই দিন অতিবাহিত হতে থাকে, ততই সরকার অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার অসমাপ্ত কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া জোরদার করতে থাকে।

ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবর্তে একের পর এক সরকার ধীরে ধীরে চুক্তি-পূর্ব শাসকগোষ্ঠীর মতো ব্যাপক সামরিকায়নের মাধ্যমে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে চলমান পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে দমন করার ষড়যন্ত্র জোরদার করতে থাকে, যা বর্তমান শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছেছে। চুক্তি-পূর্ব অবস্থার মতো বর্তমান সময়েও অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে বহিরাগত মুসলিম বসতিপ্রদান, জুম্মদেরকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরকরণ, রাষ্ট্রীয় বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহায়তায় মুসলিম সেটেলার কর্তৃক জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা ও গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া, ভূমি বেদখল ও ভূমি থেকে উচ্ছেদ, জুম্ম নারী ধর্ষণ ও অপহরণ, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে আন্দোলনরত জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকদেরকে 'সন্ত্রাসী' তকমা দিয়ে মিথ্যা মামলায় অভিযুক্তকরণ ইত্যাদি জাতিগত নির্মূলীকরণের সকল কার্যক্রম জোরদার হয়ে উঠে।

সরকার কেবল পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রমের মধ্যেই ক্ষান্ত থাকেনি, 'ভাগ করো শাসন করো' ঔপনিবেশিক নীতির ভিত্তিতে সেনাবাহিনী জুম্ম জাতিগোষ্ঠীর কতিপয় সুবিধাবাদী ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিদের নিয়ে একের পর এক সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ গঠন করে দিয়ে এবং তাদেরকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন তথা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের জন্য জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের চলমান আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে চলেছে।

বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রামের অমুসলিম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে জুম্ম জনগণ বৃহত্তর প্রতিরোধ আন্দোলনের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীর এসব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে বদ্ধপরিকর। পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামী সম্প্রসারণবাদ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে জুম্ম জনগণের মরণপণ আন্দোলন-সংগ্রামকে শক্তিশালী করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই বলে বিবেচনা করা যায়।

তাই আসুন, আজ আমরা জুম্ম জনগণ অধিকতর ঐক্যবদ্ধ ও সংহত হই এবং সকল প্রকার আত্মঘাতী বিভেদপন্থী চক্রান্তের বিষ দাঁত ভেঙে দিই। আসুন, গ্রামে-গ্রামে, শহরে-বন্দরে ছাত্র-যুব-জনতার লৌহ দৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী সকল ষড়যন্ত্র এবং সুবিধাবাদিতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা রুখে দাঁড়িয়ে জুম্ম জনগণের অধিকারের সনদ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করি। পৃথিবীর অপরাপর অগ্রসর জাতির পাশাপাশি জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জুম্মদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা করি। এম এন লারমা ও শহীদদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিজেদের অগ্রযাত্রাকে সার্থক করি। তাই সকল প্রকার বিভেদ ও ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে ইস্পাত কঠিন জাতীয় ঐক্য অধিকতর গড়ে তুলে পার্বত্য চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। পার্বত্য চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব সুরক্ষা নিশ্চিত হতে পারে। তাই বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করার মহান কার্যক্রম হোক এবারের ১০ই নভেম্বরের শপথ।

প্র ব ন্ধ

এম এন লারমার সংগ্রাম ও তার প্রাসঙ্গিকতা

মিতুল চাকমা বিশাল

ভূমিকা:

প্রাণের সৃষ্টি থেকে ধ্বংস পর্যন্ত লড়াইয়ের কোনো শেষ নেই। বস্তুর বিকাশের প্রত্যেকটি পর্যায়ে দ্বন্দ্ব ও বিপরীতের গতিগুলো বিদ্যমান থাকে। এমনকি আমাদের এই সুবিশাল ও সুবিস্তৃত মহাবিশ্বও তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলেই ক্রমাগত গতিশীল এবং বিকশিত হয়েছে। সেখান থেকে জন্ম নেওয়া গ্রহ-নক্ষত্রগুলিও নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম করে বিস্তৃতি লাভ করছে, পরিবর্তিত হচ্ছে এবং একে অপরকে প্রভাবিত করছে। এটিই সংগ্রামের রূপ। একইভাবে আমাদের এই নীলাভ পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া প্রতিটি প্রাণিই তার সূচনালগ্ন থেকেই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, নিজের আত্মপরিচয়কে মেলে ধরেছে। শুরু থেকে এই লড়াইটা হচ্ছে টিকে থাকার লড়াই, বেঁচে থাকার লড়াই, এ নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। বানর প্রজাতি থেকে মানুষে উত্তরণে আমরা যেমন শ্রমের ভূমিকাকে দেখি, একইভাবে শ্রমের দ্বারা মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশের ফলেই মানুষ আবারো মানুষকে শোষণের পথকে উন্মুক্ত করেছে। প্রকৃতিকে বশ করে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে এবং সমস্ত কিছুকে নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত করার প্রচেষ্টা করেছে। শুরুতে যে লড়াইটা প্রকৃতির বিরুদ্ধে ছিল, কালক্রমে সেটি শ্রেণি দ্বন্দ্বে এসে রূপ লাভ করে। আর এই শ্রেণি হচ্ছে সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বারা তৈরি এক অর্থনৈতিক পরিকাঠামো। সমাজ বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ নিজের মুক্তির জন্য লড়াই করেছে, এখনও করছে। নানা পর্যায়ে, নানা আঙ্গিকে লড়াইয়ের পরিধিগুলো বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করলেও, সমস্ত কিছুই একটি সাধারণ সমীকরণে এসে পৌঁছয়, সেটি হচ্ছে শোষক এবং শাসিতের সংগ্রামে। আজীবন সংগ্রামী ও বিশ্বের সেরা দার্শনিক কার্ল মার্কস সমাজ বিকাশের প্রক্রিয়ার সাথে সাথে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণিগুলোর অবস্থান ও তাদের সংগ্রামের রূপগুলিকে আবিষ্কার করেছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে লড়াইয়ের মধ্যদিয়ে মানুষ একটি শোষণহীন ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে, এই বিষয়টিও অবতারণা করে গেছেন।

ঐতিহাসিক পথপরিক্রমায় উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের উন্নতির সাথে সাথে সীমানাবিহীন এই গোল গ্রহটিতে লাল-কালো-সাদা রঙের প্রাচীর তৈরি হয়ে গেছে। উদ্ভব হয়েছে রাষ্ট্রের। এই রাষ্ট্রই আবার শোষণের অন্যতম হাতিয়ার, বলা যায় মোক্ষম হাতিয়ার। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরে ভারত-পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পরবর্তীতে সংবিধান প্রণয়নের মধ্যদিয়ে এই রাষ্ট্রগুলো একেবারে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি পায়। ঐতিহাসিকভাবে ধর্মীয় জাতীয়তার উপর ভিত্তি করে পার্টিশনের কাজ হলেও এর ভেতরের রাজনীতিটা যে চলমান ছিল, সেটা নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। অতএব পাকিস্তান জন্ম লাভ করলেও ভৌগলিকগতভাবে এর দুটি অংশ থেকে গেল। যার একটি পূর্ব পাকিস্তান এবং অপরটি পশ্চিম পাকিস্তান। আশ্চর্যজনকভাবে এটিই চরম সত্য যে, পাকিস্তান হওয়া সত্ত্বেও ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত দিক দিয়ে এই দুটি অঞ্চলের মানুষগুলোর মধ্যে ছিল বিস্তর ফারাক। এমনকি উভয় অঞ্চলেই ভিন্ন সংস্কৃতির, ভিন্ন অর্থনৈতিক জীবনধারার লোকের বসবাস ছিল। অতএব, ধর্মীয় দিকটি ছাড়া বাকি সমস্ত বিষয়ে বৈচিত্র্যতা বা ভিন্নতা ছিল। ইতিহাসের নির্মম সত্য এটাই যে, সময়ের আবর্তে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করতে শুরু করে এবং এরই বিরুদ্ধে ভেতরে-বাইরে সংগ্রাম শুরু হয়। যার সুত্রপাত ঘটে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে এবং শেষ পরিণতি ঘটে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়ে। অতএব, শোষকের নাগপাশ ছিন্ন করে শোষিতরা নিজেদের অধিকারকে ছিনিয়ে এনেছে। এর চেয়ে গর্বের আর কী হতে পারে!

কার সংবিধান?

কিন্তু ইতিহাসের চাকাটা যেন আচমকা ঘুরে গেল। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটি এমন একটি খসড়া সংবিধান পেশ করলো, যেখানে উগ্রতার বহিঃপ্রকাশ বাদে, আর কোনো কিছুই দেখা গেল না। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের ধূঁয়ো তুলতে দেখা গেলেও, কার্যত স্বৈরাচারী, একনায়কতান্ত্রিক, একজাতি, একরাষ্ট্র গঠনের একধরনের জঘন্য ও হীন প্রচেষ্টাকে আমরা দেখতে পেলাম। যে আশা, আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্ন নিয়ে দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য একটি নিরাপদ ভবিষ্যতের আশায় বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, দেশের সংবিধান সেই অধিকারগুলো দিতে পারে নি। শোষণের বিরুদ্ধে যে গণজোয়ারে দেশ স্বাধীন হয়েছিল, স্বাধীনতার প্রারম্ভেই মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হলো রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে। দেশের মেহনতি মানুষের রাজনৈতিক অধিকারকে জলাঞ্জলি দিয়ে পাকিস্তান আমলের সেই আমলা ও পুঁজিপতিদের

দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় মনোনিবেশ করা হলো। একপ্রকার দেশের কৃষক-শ্রমিকের রাজনৈতিক অধিকারকে এবং তাদের প্রতিনিধিত্বকে অস্বীকার করা হলো।

যেকারণে আইনসভার মতন মহান জায়গায় দাঁড়িয়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলেছিলেন, 'বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা পুরোপুরি এই সংবিধানে নাই।' তিনি পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কুশিয়ারা, বুড়িগঙ্গা প্রভৃতি নদীতে যারা নৌকা বেয়ে, দাঁড় টেনে চলেছেন, সেই সকল মেহনতি মানুষদের কথা বলতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন সেই মানুষদের কথা, যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শক্ত মাটি চষে সোনার ফসল ফলিয়ে চলেছেন। বলেছিলেন, সেই সকল সংগ্রামীদের কথা, যারা রাস্তায় রাস্তায় রিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছে। একবাক্যে তিনি বলেছিলেন, তাদের মনের কথা এই সংবিধানে লেখা হয় নাই।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ১৯৭২ সালের সেই বাণী, সেই কথা স্বাধীনতার ৫১ বছরে এসেও এখনও জীবিত। আজকে বাংলাদেশের জনগণ সাড়ে সাত কোটি থেকে সাড়ে সতের কোটিতে পরিণত হয়েছে, কিন্তু বিগত ৫০ বছরে বাংলার কোনো জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় নি। মুষ্টিমেয় কিছু আমলা আর পুঁজিপতির হাতে দেশের সমস্ত সম্পদ ও ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণ হয়েছে, দেশের মানুষকে লুটেপুটে খাওয়ার প্রতিযেগিতায় নামিয়ে দেয়া হয়েছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, বেকারত্ব, সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ও সামাজিক পরিষেবা সবদিক দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ আজ এক অসহনীয় দূর্ভোগ পোহাচ্ছে। দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ২,৮৪০ মার্কিন ডলার এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.২৫% দেখানো হলেও, বাস্তবিকপক্ষে এই আয় এবং জিডিপি কোনোমতেই দেশের সমগ্র জনগণের আয়ের মাত্রা নির্ধারণ করে না। এটি কেবল একটি গড় হিসাব মাত্র। যেখানে মুষ্টিমেয় কিছু ধনিক শ্রেণি ও আমলাদের আকাশচুম্বী আয়ের সাথে মেহনতি মানুষের আয়ের মোট হিসাবের গড় হিসাবকেই দেখানো হয় মাত্র। দেশে অতি দ্রুততার সাথে ধনী এবং অতি ধনীদের সংখ্যা যেমন একদিকে বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরদিকে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার সংখ্যাটাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বৈষম্য এখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। যেটি ১৯৭২ সালে জুম্ম জাগরণের অগ্রদূত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত ১০ এবং ২০ নং অনুচ্ছেদের অবতারণা করে বলেছিলেন যে, 'একদিকে হিংসাদ্বেষ বিহীন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, আর অন্যদিকে উৎপাদন যন্ত্র ও উৎপাদন-ব্যবস্থাসমূহের মালিকানা রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায়ী মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে শোষণের পথকে প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছে। আমরা এমন এক ক্ষমতা দেখতে পাচ্ছি, যে ক্ষমতা বলে সরকার একটা লোককে এক পয়সার অধিকারী হতে দেবেন এবং অন্য একটা লোকের জন্য এক কোটি মালিকানার অধিকার রেখে দেবেন।'

আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশের পুঁজিপতি আর বড় বড় মুৎসুদ্দীরাই রাষ্ট্রের হর্তাকর্তা। নিজেদের প্রয়োজনে এবং নিজেদের সুবিধার্থে আইন প্রণয়ন করে তারা দেশকে প্রতিনিয়ত লুটেপুটে খাচ্ছে। লাভের আশায় গোডাউন ভর্তি পণ্য মজুদ রেখে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে জনগণের দূর্ভোগ বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

অপরদিকে সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে যে জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে, সেই জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, 'ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।' স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, সংবিধানের মূলনীতিতেই বাঙালি ভিন্ন বাংলাদেশে বসবাসরত অন্য সকল জাতিগোষ্ঠীকে কলমের এক খোঁচাতেই উধাও করে দেওয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে যে বাঙালি ছাড়াও দেশের আদিবাসী সম্প্রদায় অংশগ্রহণ করেছিল, জীবনদান দিয়েছিল, নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই অবদানকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট বাঙালি জাতির ঐক্য এবং সংহতিকে তুলে ধরা হয়েছে।

বাস্তবিক পক্ষে পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো জাতিরাষ্ট্র নেই, যা কেবল নিরঙ্কুশ একক জাতি দ্বারা গঠিত। আমরা রাশিয়া, আমেরিকা, চীন, ভারত, বার্মা ইত্যাদির মতন বিশ্বে জাতিবহুল অনেক রাষ্ট্র দেখতে পাই, কিন্তু একক জাতির কোনো রাষ্ট্রের নজির পৃথিবীতে নেই। অধুনা বাংলাদেশেও বর্তমানে বাঙালি ভিন্ন ৫৪টির অধিক আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী রয়েছে, যারা ভাষাগত, সংস্কৃতিগত, অর্থনৈতিক ও সর্বোপরি রাজনৈতিকভাবে দেশের মূল স্রোতধারার বাঙালি জনগোষ্ঠী থেকে এবং পরস্পরের থেকেও সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। অপরদিকে বাংলাদেশের সংবিধানে এমন এক অলীক রাষ্ট্রের কল্পনা করা হয়েছে, যেখানে কেবল বাঙালি জাতিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং দেশের সমস্ত জনগণ ও নাগরিককে বাঙালি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের সূচনা থেকেই চাপিয়ে দেওয়া এবং দাবিয়ে রাখার এক উলঙ্গ মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। অথচ বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি হিসেবে আমরা যাকে চিনি, সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে বলেছিলেন যে, 'বাংলার সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না।'

আশ্চর্যজনকভাবে এটাই সত্য এবং বাস্তব যে, সেই ব্যক্তির জীবদ্দশাতেই দেশের সংবিধানে কোনো জাতিকে দাবিয়ে রাখার মতন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হলো একেবারে নির্দ্বিধায় এবং নিঃসংকোচে। সর্বোপরি এটি এমন এক সংবিধান যেখানে ৫৪টির অধিক আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর রাজনৈতিক অধিকারকে সম্পূর্ণরূপে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের এক দশমাংশ অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামের মত একটি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিশিষ্টতায় পরিপূর্ণ অঞ্চলকে সাধারণভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং এই অঞ্চলের জন্য কোনো বিশেষ বিধানই এই সংবিধানে রাখা হয়নি। যার জন্য এম এন লারমা বলেছিলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস হল বিভিন্ন জাতিসত্তার ইতিহাস। কেমন করে সেই ইতিহাস আমাদের সংবিধানের পাতায় স্থান পেল না, তা আমি ভাবতে পারি না। সংবিধান হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা, যা অনগ্রসর জাতিকে, পিছিয়ে পড়া, নির্যাতিত জাতিকে, অগ্রসর জাতির সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে নিয়ে আসার পথ নির্দেশ করে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এই পেশকৃত সংবিধানে আমরা সেই রাস্তার সন্ধান পাচ্ছি না।'

এরই আলোকে ১৯৭২ সালের ২ নভেম্বর সংবিধান বিলের উপর আলোচনায় তিনি প্রস্তাব করেন যে, '৪৭ অনুচ্ছেদের পরে নিম্নোক্ত নতুন অনুচ্ছেদটি সংযোজন করা হোক:

'৪৭ক। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি উপজাতীয় অঞ্চল বিধায় উক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারের নিরাপত্তার জন্য উক্ত অঞ্চল একটি উপজাতীয় স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল হইবে।' কিন্তু এম এন লারমার সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়া হয়।

আমি বাঙালি নই:

সত্যি বলতে দেশ বিভাগের পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদেরকে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী একধরনের সন্দেহ আর অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়েও চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বনকে সমগ্র জুম্ম জাতির উপর চাপিয়ে দেওয়ার এক ধরনের হীন মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। যার জন্য মুক্তিযুদ্ধে পাহাড়িদের অংশগ্রহণকে সহজে মেনে নিতে পারে নি তৎকালীন অনেক বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা, এমনকি পাহাড়িদেরকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করা হয়। ১৯৭১ সালের মে মাসে ক্যাপ্টেন খালেক ও জমাদার খায়রুজ্জামানের নেতৃত্বে রাঙামাটির তবলছড়ি, তনদাং, রামসিরা, দেওয়ানপাড়া এবং রামগড় অপারেশন, ০৫ ডিসেম্বর পানছড়ির শিলছড়ি অপারেশন, যেখানে ৩২ জন পাহাড়িকে খুন করা হয়। এছাড়াও মুক্তিবাহিনীর হামলায় ১৪ ডিসেম্বর খাগড়াছড়িতে ২২ জন নিহত হয় এবং ২১ ডিসেম্বর দীঘিনালায় ৯ জনকে হত্যা করা হয়। একইভাবে ১৯৭২ সালে বিডিআর (বর্তমান বিজিবি)-এর সদস্যরা পাহাড়ে হত্যা, ধর্ষণ ও লুটপাটে নেমে পড়ে। তন্মধ্যে ২২ মার্চ ধলিয়া, ২২ ও ২৩ এপ্রিল বৈরাগী বাজার এবং ৮ মে খাগড়াছড়ির তারাবন্যা উল্লেখযোগ্য।

> রাষ্ট্রের ও শাসকগোষ্ঠীর নগ্ন চরিত্রটি উন্মুক্ত হয়ে গেল আরো একবার। রাষ্ট্রের এই যে বাঙালিয়নের নীতি, এটি কোনো একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিচায়ক হতে পারে না। বৈষম্য, বর্ণবাদ, বিভেদ সমস্ত কিছুর দেয়াল রাষ্ট্র আপনা থেকেই তৈরি করে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত এবং এর মধ্যদিয়ে দেশের বাঙালি ভিন্ন জনগণকে বিচ্ছিন্ন করার একটা পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়। অথচ একজন বাঙালি যেমন কখনও চাকমা, মারমা, বেলুচ বা রুশ ইত্যাদি হতে পারেন না, তেমনি একজন রুশ, চাইনিজ, মারমা, চাকমাও কখনই বাঙালি হতে পারেন না। কিন্তু রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতরে বাংলাদেশের বাঙালি ভিন্ন সকল জাতিগোষ্ঠীকে বাঙালি বলে পরিচিত করানো হয়েছে। চরম জাত্যভিমান আর উগ্রতা না থাকলে এরকম কখনই হওয়ার কথা নয়।

ফলশ্রুতিতে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের প্রারম্ভ থেকেই কেবল নয় বরং দেশবিভাগের পর থেকে পাহাড়িদের নিয়ে ষড়যন্ত্রের শেষ নেই। ঐতিহাসিকভাবে স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত এই পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে রূপায়িত করার পরিকল্পনা এবং পাহাড়ি বিহীন এক পাহাড় তৈরি করার পরিকল্পনা যেকোনো শাসকগোষ্ঠীর কাছেই ছিল। অতএব তারা কখনও কৌশলে, কখনও উন্নয়নের নাম দিয়ে প্রকাশ্যে, কখনও বা একেবারে দমননীতি তথা বলপ্রয়োগের নীতির দ্বারা পাহাড়িদের উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র আমরা দেখতে পাই। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বাংলাদেশের সংবিধানে পাহাড়িদের জন্য আলাদা কোনো বিশেষ বিধান রাখা হয়নি, কেবলমাত্র তাদের সংস্কৃতিকে সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছিল। অপরদিকে ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর আব্দুর রাজ্জাক ভূঁইয়ার

প্রস্তাবে সংবিধানের ৬নং অনুচ্ছেদের সংশোধনী আনা হয়, যেখানে বলা হয়েছে '৬। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে, বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন।'

এই সংশোধনীর ব্যাপারে এম এন লারমার বক্তব্য ছিল, 'আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বসবাস করে আসছে, বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় বাঙালিদের সঙ্গে আমরা লেখাপড়া শিখে আসছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সবদিক দিয়ে আমরা একসঙ্গে একযোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ-দাদা, চৌদ্দ পুরুষ কেউ বলে নাই, আমি বাঙালি।'

তাঁর এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে স্পীকারের প্রশ্ন ছিল, 'আপনি কি বাঙালি হতে চান না?'

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আবারো বলেন, 'আমাদিগকে বাঙালি জাতি বলে কখনও বলা হয় নাই। আমরা কোনোদিনই নিজেদেরকে বাঙালি বলে মনে করি নাই। আজ যদি এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধানের জন্য এই সংশোধনী পাশ হয়ে যায়, তাহলে আমাদের এই চাকমা জাতির অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা আমাদেরকে বাংলাদেশী বলে মনে করি এবং বিশ্বাস করিও। কিন্তু বাঙালি বলে নয়।'

কিন্তু সংশোধনী পাশ হয়ে যায়। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এই সংশোধনীর প্রতিবাদ স্বরূপ গণপরিষদের কক্ষ ত্যাগ করে চলে যান এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য গণপরিষদ বৈঠক বর্জন করেন। অপরদিকে ২০১১ সালে এসে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে বলা হয় যে, '৬(১) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে। এবং ৬(২) বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি ও নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।'

সর্বোপরি রাষ্ট্রের ও শাসকগোষ্ঠীর নগ্ন চরিত্রটি উন্মুক্ত হয়ে গেল আরো একবার। রাষ্ট্রের এই যে বাঙালিয়নের নীতি, এটি কোনো একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিচায়ক হতে পারে না। বৈষম্য, বর্ণবাদ, বিভেদ সমস্ত কিছুর দেয়াল রাষ্ট্র আপনা থেকেই তৈরি করে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত এবং এর মধ্যদিয়ে দেশের বাঙালি ভিন্ন জনগণকে বিচ্ছিন্ন করার একটা পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়। অথচ একজন বাঙালি যেমন কখনও চাকমা, মারমা, বেলুচ বা রুশ ইত্যাদি হতে পারেন না, তেমনি একজন রুশ, চাইনিজ, মারমা, চাকমাও কখনই বাঙালি হতে পারেন না। কিন্তু রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতরে বাংলাদেশের বাঙালি ভিন্ন সকল জাতিগোষ্ঠীকে বাঙালি বলে পরিচিত করানো হয়েছে। চরম জাত্যভিমান আর উগ্রতা না থাকলে এরকম কখনই হওয়ার কথা নয়।

যারা মরতে জানে তারা অজেয়:

পৃথিবীর বহুদেশে, বহুরাষ্ট্রে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের জন্য লড়াই হয়েছে, যুদ্ধ হয়েছে, সংগ্রাম হয়েছে। ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম লেখা আছে স্বর্ণখচিত হয়ে। মানুষ কিসের আশায় লড়াই করে? কিসের নেশায় যুদ্ধ করে? কেন মানুষ মৃত্যুকে এত সহজে আলিঙ্গন করে?

উত্তর একটাই, বেঁচে থাকার তাগিদে। মানুষ হিসেবে মানুষের মতন আত্মসম্মান আর আত্মমর্যাদা নিয়ে খেয়ে-পড়ে বেঁচে থাকতে। নিজের স্বাতন্ত্র্যতা, স্বকীয়তা আর অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে। এই লড়াই হচ্ছে নিরাকরণের নিরাকরণ, এই যুদ্ধ হচ্ছে একের বিদায়ে অপরের আবির্ভাব। মৃত্যু দিয়ে নতুনের সূচনা করা। ধ্বংস করে সৃষ্টিকে আলিঙ্গন করা। তজ্জন্যই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা হয় জনসংহতি সমিতি গঠনের মধ্যদিয়ে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী প্রথম রাজনৈতিক দল হিসেবে জনসংহতি সমিতির আবির্ভাব এতদঞ্চলের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে এক ভিন্ন মাত্রায় বিকশিত করে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর ভোগবিলাসের রঙিন জীবনকে ঠেলে দিয়ে অরণ্যে ঘেরা কঠিন এক জীবনকে আলিঙ্গন করেছিলেন এম এন লারমা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, পাহাড়ের প্রতিটি কোণে কোণে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়ে জাগ্রত করেছিলেন ঘুমন্ত পাহাড়িকে। তিনি একাধারে এক স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্বপ্ন পূরণের কান্ডারিও বটে। তিনি যেমন স্বপ্ন দেখতেন একটি সুন্দর, শোষণহীন ও বৈষম্যহীন সমাজের, ঠিক তেমনি পাহাড়ের মানুষকেও এই স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। তিনি এবং তাঁর আদর্শে গঠিত মহান পার্টি জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে বোঝাতে সমর্থ হয়েছিল যে, এই লড়াই একা জনসংহতি সমিতির নয়, এই লড়াই একা এম এন লারমার নয়। বরং এই লড়াই সমগ্র জুম্ম জনগণের, এই লড়াই সমস্ত নিপীড়িত মেহনতি মানুষের, এই লড়াই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের, এই লড়াই শোষণের বিরুদ্ধে শাসিতের।

তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত তরুণ প্রজন্মের উদ্যমে পাহাড়ের মানুষ স্বপ্ন দেখতে শিখেছে, বাঁচতে শিখেছে নতুন করে, শোষণের শৃঙ্খল ভেঙে লড়াই করতে শিখেছে। পাহাড়ের ভিন্ন ভাষাভাষি জাতিগোষ্ঠীদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে তিনি উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন জুম্ম জাতীয়তাবাদের। যে জাতীয়তাবাদ একদিকে যেমন স্বতন্ত্রতার বহিঃপ্রকাশ, অপরদিকে এ যেন এক আন্তর্জাতিকতাবাদ।

ইংরেজিতে একটা কথা আছে 'One man's revolution is another man's terrorism', পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম

জনগণের জন্য যেটি ছিল একটি বিপ্লবী আন্দোলন, সেটিই বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী তথা নিপীড়কের কাছে ছিল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। কিন্তু এটিই বাস্তব সত্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের উপর এই অন্যায় যুদ্ধ ও আগ্রাসন রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠীই জোর করে চাপিয়ে দিয়েছিল। পার্বত্য জনগণের রাজনৈতিক অধিকারের অস্বীকৃতি, বাঙালি হয়ে যাওয়ার হুমকি ও দাবিয়ে রাখার মানসিকতা থেকে পাহাড়ে সেনা মোতায়েনকরণ সত্যিই এক উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে এবং এসবের দ্বারাই শাসকগোষ্ঠী পাহাড়ে দমননীতির আশ্রয় নিয়ে পাহাড়িদের উপর এক অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত না করে এই সমস্যাকে অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা এবং সমাধানের জন্য বলপ্রয়োগের নীতি অবলম্বন করা রাষ্ট্রের দমননীতিরই বহিঃপ্রকাশ। যার দরুণ পাহাড়ে ৩টি সেনানিবাস স্থাপন ও পরপর সমতল থেকে বাঙালি অনুপ্রবেশ করে এতদঞ্চলের জনমিতিতে ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়। রাষ্ট্রযন্ত্র এই অন্যায় যুদ্ধকে অন্য মাত্রা দিতে তাদের এই অপকর্মের সাথে নিরীহ বাঙালি জনগোষ্ঠীকেও যুক্ত করেছে এবং সেই সমস্ত নিরীহ বাঙালিকে প্রশিক্ষণ আর ব্রেইন ওয়াশ করে উগ্র আর হিংস্র জানোয়ারে পরিণত করে মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে। ফলশ্রুতিতে পাহাড়ের এই সমস্যাকে তার মূল চরিত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে পাহাড়ি-বাঙালি সমস্যা তথা জাতিগত ও সম্প্রদায়গত একটি সমস্যায় পর্যবসিত করার বৃথাচেষ্টা করা হয়েছে।

কিন্তু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার লড়াইটা নেহাতই কেবল কোনো জাতির বিরুদ্ধে নয়, তাঁর লড়াইটা হচ্ছে শাসকের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে, অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে। প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক নতুন সমাজ বিনির্মাণের লড়াই। তাঁর এই লড়াই কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ছিল না, তিনি কখনই বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা বলেননি। বরং বাংলাদেশের রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতরে থেকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার চেয়েছিলেন। সুদীর্ঘ এই ঐতিহাসিক লড়াইয়ে প্রাপ্তি এবং অর্জনের খাতায় অনেক কিছু যেমন রয়েছে, তেমনি ত্যাগ আর হারানোর খাতাতেও অনেক কিছুই রয়েছে। জনসংহতি সমিতির কর্মীদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ পরবর্তী প্রজন্মকে নিঃসন্দেহে আরো বেশি করে অনুপ্রাণিত করে।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার অমোঘ বাণী, 'ক্ষমা গুণ, শিক্ষা গ্রহণের গুণ, পরিবর্তিত হওয়ার গুণ, এই তিন গুণের অধিকারী না হলে প্রকৃত বিপ্লবী হওয়া যায় না।' মুক্তির নেশা এমন এক নেশা, যে নেশা মানুষকে এক নতুন মানুষে রূপান্তরিত করে। সকল বাধা অতিক্রমের দুঃসাহস যোগায়। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নেশায় ছুঁটে চলা প্রত্যেকটি মানুষ তাই হয়ে ওঠেন এক অনন্য মানুষে। মানুষের প্রতি ভালোবাসা আর দেশাত্মবোধের প্রেমে লড়াইয়ের সেই সৈনিকেরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করে। মৃত্যু যেন হয়ে ওঠে তাদের অলংকার। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনমানুষের মুক্তির কান্ডারি এম এন লারমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে অরণ্যকে আপন করে নেয় পাহাড়ের অজস্র তরুণ। সর্বপ্রথম নিজের সাথে লড়াইয়ের দৃঢ় মানসিকতা অর্জন করে, পরে প্রকৃতির সাথে লড়াই করে টিকে থাকার সংগ্রামকে আয়ত্তে নিতে হয়। এটি কোনো সাধারণ বিষয় নয়। নিজের আত্মসংযম আর মনকে নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি প্রকৃতির সাথে মিশে থাকার এক অনন্য অভিজ্ঞতা অর্জনে ব্রতী হতে হয়। অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে সমর্পিত এই বীর যোদ্ধারা পোড় খেয়ে খেয়ে হয়ে ওঠেন একেকটি জীবন্ত বুলেট, যারা শত্রুর বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের নায্য আন্দোলনকে ধূলিস্যাৎ করতে রাষ্ট্রযন্ত্র নানাভাবে অগ্রসর হয়েছে। কখনও উন্নয়ন, কখনও বা সামরিকায়ন, কখনও বা বহিরাগতের অনুপ্রবেশকরণ, কিন্তু আন্দোলনকে দমাতে পারে নি, এই জুম্ম জনগণকে দমাতে পারে নি। ১৯৮৩ সনে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়ে যখন গিরি-প্রকাশরা পার্টির ক্ষমতা দখলের এক রাজনৈতিক উন্মত্ততায় মেতে ওঠেছিল, এম এন লারমা তখনও ছিলেন শান্ত ও উদ্দীপ্ত। সুবিধাবাদী সেই চক্ররা যখন, এম এন লারমাকে মারতে এগিয়ে এসেছিল, তখন তিনি একবাক্যে বলেছিলেন, 'তোমরা আমাকে মেরে কী পাবে? আমাকে মেরে যদি তোমরা এই জুম্ম জাতির অধিকার ছিনিয়ে আনতে পারো, তাহলে আমার কোনো দুঃখ নেই। আমি মরতে প্রস্তুত।'

এম এন লারমার প্রাসঙ্গিকতা:

এম এন লারমা। একটি নাম, একটি স্বপ্ন, একটি আদর্শ। লড়াইয়ের কান্ডারি, সংগ্রামের অগ্নিশিখা। যে নামের সাথে জড়িয়ে রয়েছে পাহাড়িদের রাজনৈতিক লড়াইয়ের সূচনার একটি রক্তাক্ত বর্ণিল অধ্যায়। ১৯৮৩ সালের ভয়াল সেই কালো রাতে জাতির কুলাঙ্গাররা মহান নেতা এম এন লারমাকে হত্যা করতে পারলেও, তাঁর আদর্শকে, তার চেতনাকে তারা হত্যা করতে পারে নি। বরং সময়ের পরিক্রমায় এটি আরো বেশি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, জীবিত এম এন লারমার চেয়ে, শহীদ এম এন লারমা আরো শক্তিশালী, আরো উদ্দীপ্ত।

জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবন আলোকপাত করলে, তাঁর সংগ্রামী জীবনের প্রত্যেকটি অধ্যায় বিবেচনা করলে বুঝতে পারা যায়, তিনি কতটা সাহসী আর এক আদর্শবান নেতা ছিলেন। তাঁর জীবনদর্শন ছিল ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর, সেখানে ব্যক্তি স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার কোনো স্থানই ছিল না। তাঁর

আবির্ভাব কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্যই নয়, বরং সমগ্র বাংলাদেশের ইতিহাসেই স্মরণীয়। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সমগ্র দেশের নিপীড়িত-নির্যাতিত ও বঞ্চিত মানুষের কথা মহান সংসদে দাঁড়িয়ে নিঃসংকোচে, নির্দ্বিধায় বলে গেছেন অনর্গল।

পার্বত্য চট্টগ্রামে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার হাত ধরে। যিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন এক সুন্দর পার্বত্য চট্টগ্রামের, যিনি স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন এক উন্নত ও প্রগতিশীল পার্বত্য চট্টগ্রামের। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার গন্ডি পেরিয়ে, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার দৃপ্ত শপথ নিয়ে এগিয়েছিলেন তিনি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, জাতির মুক্তির জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। সুতরাং সেই লক্ষ্যে শহরের বিলাসিতা আর রঙিন জীবনকে ছেড়ে পাড়ি জমান জুম পাহাড়ে আলো ছড়িয়ে দিতে। তাঁর প্রদর্শিত আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে তাই 'টিচার্স রেভুল্যুশন' নামেও আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর চিন্তা, তাঁর সমগ্রতায় ব্যক্তিস্বার্থের কোনো ঠাঁই হয়নি, তাঁর চিন্তা ছিল ব্যাপকতায়, সমগ্রতায়, জুম্ম জাতির অধিকার আদায়ে এবং সর্বোপরি এই মানবজাতির মুক্তির কল্যাণে।

বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫২ বছরে এসে আজ যে অবস্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেটি মহান নেতা অনেক আগে থেকেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। ১৯৭৪ সালের ০৫ জুলাই বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনায় এমএন লারমা বলেছিলেন, 'এই বাজেটে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন দেখানো হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য টাকার প্রয়োজন। কিন্তু রাষ্ট্র কেন পরিচালনা করা হয়? রাষ্ট্রে কে থাকে? রাষ্ট্রের মধ্যে যারা থাকে তারা মানুষ। মানুষের জন্যই রাষ্ট্র গঠিত হয়। মানুষের মঙ্গলের জন্য এবং তাদের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশের জন্যই রাষ্ট্র গঠন হয়। মানুষের মঙ্গলের জন্য মানুষের অর্থেই রাষ্ট্র পরিচালনার যন্ত্র চলে।'

তিনি আরো বলেছিলেন, 'আজকে মানুষের জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নাই। আমরা সংসদ সদস্য যারা আছি, আমাদেরও কোনো নিরাপত্তা নাই। আর যারা রিক্সা চালায়, ঠেলাগাড়ি চালায়, গরুর গাড়ি চালায়, রেলগাড়ি চালায় অর্থাৎ এক কথায় জনসাধারণের কারো জীবনের নিশ্চয়তা নাই। আমরা চাই নি যে, আমাদের ঘরবাড়ি সুন্দর হোক, আমাদের ভালো খাবার দেওয়া হোক। আমরা শুধু দুই বেলা পেট ভরে ভাত খেতে চাই, নির্বিঘ্নে ঘুমাতে চাই, আর রোগের জন্য একটু ঔষধ চাই। সরকার যদি এটা দিতে পারেন, তাহলে আইন শৃঙ্খলার কখনই অবনতি হবে না।'

সংবিধানের ১৪৯নং অনুচ্ছেদের দ্বারা ১৯০০ সালের শাসনবিধিকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে মহান নেতা বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক শাসিত এলাকা অর্থাৎ Excluded area হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে নামেমাত্র এই অনুচ্ছেদের মাধ্যমে, কিন্তু সংবিধানে 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি' এবং 'মৌলিক অধিকারের' অধ্যায়ের স্বীকৃতি দেননি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম Excluded area status পেলেও তার প্রকৃত মর্যাদা বাস্তবে কার্যকর হচ্ছে না। এই অন্তঃসারশূন্য স্বীকৃতি পার্বত্য চট্টগ্রমের 'কালো অধ্যায়ের' সূচনা করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি জনগণ তাদের সত্তা হারাতে বসেছে।'

বাস্তবিকপক্ষে মহান নেতার এই ভবিতব্য বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন হচ্ছে। ১৯৯৭ সালে ঐতিহাসিক পার্বত্য চুক্তির মধ্যদিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জন্য পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের সমন্বয়ে একটি বিশেষ শাসন কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। এই চুক্তির আলোকে দেশের সমস্ত প্রচলিত আইনের সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন কিংবা পরিবর্ধন ও রহিতকরণের বিধান থাকলেও সরকার তাদের ইচ্ছামত ও প্রয়োজন অনুসারে এখনও ১৯০০ সালের শাসনবিধিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রয়োগ করে চলেছে। এই আইনের অজুহাতে পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারগণ পাহাড়ের বিশেষ শাসনব্যবস্থার প্রতিনিধিদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে চলেছে। একইসাথে স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে সার্কেল চীফদের পাশাপাশি এই ডেপুটি কমিশনারগণও এই কার্যক্রম চলমান রেখেছেন। যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সম্পূর্ণ লঙ্ঘন। সমতল থেকে আসা বহিরাগতরা ডেপুটি কমিশনারগণ কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটের মাধ্যমে পাহাড়ে বসতি স্থাপন করে জায়গা-জমি কিনে পার্বত্যবাসী বনে যাচ্ছে। আর এই বহিরাগতদের ক্রমাগত অনুপ্রবেশের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে আজ পাহাড়িরাই সংখ্যালঘুতে পরিণত হতে চলেছে। ২০২২ সালের জনশুমারীতে প্রদত্ত তথ্য-উপাত্ত দেখলেই সেটা সহজে বুজতে পারা যায়। এমনকি ডেপুটি কমিশনার এই শাসনবিধির ক্ষমতাবলে পার্বত্য চট্টগ্রানের জমিগুলো পূনর্বাসিত বাঙালি জনগোষ্ঠী ও কোম্পানির নামে লিজ দিয়ে চলেছেন, যা পাহাড়িদেরকে দিন দিন অস্তিত্ব সংকটের দিকে ধাবিত করছে।

উপসংহার:

মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছিলেন একজন দার্শনিক ও বিপ্লবী। তাঁর চিন্তা কেবল এই অধিকারহারা জুম্ম জাতিকে ঘিরে ছিল না। তাঁর চিন্তা ছিল আরো ব্যাপকতায়, আরো সমগ্রতায়। তিনি একাধারে ছিলেন এই জুম্ম জাতির, পক্ষান্তরে তিনিই ছিলেন সমগ্র মেহনতি মানুষের, নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের পরম বন্ধু। বিশ্বের নানাপ্রান্তে শোষণের বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলন থেকে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার

আদায়ের সংগ্রামকে কখনই বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি। তাই তিনি যেমন একজন জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক নেতা, অপরদিকে তিনিই আবার আন্তর্জাতিকতাবাদী একজন মহান দার্শনিক। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের পাশাপাশি তিনিই একমাত্র সাংসদ, যিনি দেশের সমগ্র মানুষের, কৃষক-শ্রমিক, জেলে-রিক্সাওয়ালা ও নারীদের বিষয়ে কথা বলেছেন। তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি প্রথম গণপরিষদের মতন মহান জায়গায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাওয়ার কথা বলেছিলেন। পাহাড়ের ঘরে ঘরে যে চেতনার অগ্নিমশাল তিনি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন, সেই মশালের আলো আজ পাহাড় থেকে পাহাড়ে প্রজ্বলমান। সেই মশালের আলোয় আজ পাহাড় আবার নতুন করে আলোকিত হতে শুরু করেছে, আরো নতুন করে লড়াইয়ে নামতে শুরু করেছে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে হত্যার মধ্যদিয়ে গিরি-প্রকাশরা যে স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটাতে চেয়েছিল, সেই স্বপ্নেরা এখনও পাহাড়ের প্রতিটি ঘরে ঘরে খেলা করে। তার সেই আশা, সেই আকাঙ্ক্ষা, 'আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র হবে, দেশে অভাব থাকবে না, হাহাকার থাকবে না, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ থাকবে না, হিংসা, দ্বেষ, বিদ্বেষ কিছুই থাকবে না, শুধু থাকবে মানুষে মানুষে প্রেম, প্রীতি, মায়া, মমতা এবং তার দ্বারা এক নতুন সমাজ গড়ে উঠবে। মানবতার এই ইতিহাস থাকবে এবং তাতে লেখা থাকবে 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই'।' এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জনগণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে পৃথক আবাসভূমি।

> 'আজকে খসড়া সংবিধান যদি এই গণপরিষদ-এ এইভাবে গৃহীত হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার যে আপত্তি আছে, সে আপত্তি হল, আমার বিবেক, আমার মনের অভিব্যক্তি বলছে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা পুরোপুরি এই খসড়া সংবিধানে নাই। যদি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা এই সংবিধানে থাকত, তাহলে আমার আপত্তির কোন কারণ থাকত না। কিন্তু আজ আমি দেখতে পাচ্ছি পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, মাথাভাঙ্গা, শঙ্খ, মাতামূহুরী, কর্ণফুলী, যমুনা, কুশিয়ারা প্রভৃতি নদীতে রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে যাঁরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরে নিজেদের জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করে নৌকা বেয়ে, দাঁড় টেনে চলেছেন, রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাঁরা শক্ত মাটি চষে সোনার ফসল ফলিয়ে চলেছেন, তাঁদেরই মনের কথা এ সংবিধানে লেখা হয়নি। আমি বলছি, আজকে যাঁরা রাস্তায় রাস্তায় রিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছেন, তাঁদের মনের কথা এই সংবিধানে লেখা হয়নি।'
>
> *– মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

পাভেল পার্থ

১৯৮৩ সনের ১০ নভেম্বর ৪৪ বছর বয়সে নিহত হন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। মৃত্যুর তেত্রিশ বছর পর দশম জাতীয় সংসদের দ্বাদশ (২০১৬ সনের ৪র্থ) অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে তাঁর প্রতি শোকপ্রস্তাব আনে রাষ্ট্র। দশম জাতীয় সংসদের দ্বাদশ অধিবেশনে কবি শহীদ কাদরী, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার এজাহারদাতাবাদী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আফম মহিতুল ইসলাম, আওয়ামীলীগ নেত্রী অধ্যাপিকা নাজমা রহমান, মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানু মিতিল, কিংবদন্তী বক্সার মোহাম্মদ আলী, মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু সিডনি শনবাগী, শাবিপ্রবির সাবেক উপাচার্য ছদরুদ্দিন আহমেদ, কৌতুক অভিনেতা ফরিদ আলী, টঙ্গীতে টাম্পাকো ফয়েলস কারখানার বয়লার বিস্ফোরণ ও বরিশালে বানারীপাড়ায় সন্ধ্যা নদীতে লঞ্চডুবিতে এবং দেশ ও বিদেশের বিভিন্নস্থানে দুর্ঘটনায় নিহতের স্মরণে শোকপ্রকাশ করা হয়। শোকপ্রস্তাব আনা হয় আট জনের নামে। সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য এম আব্দুর রহিম, সাবেক প্রতিমন্ত্রী মোঃ কোরবান আলী ও মোঃ ফজলুর রহমান পটল, সাবেক সংসদ সদস্য আলহাজ্ব অধ্যাপক ডা. এম এ মান্না, আলী রেজা রাজু, আব্দুর রাজ্জাক খান ও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এবং সংসদ সচিবালয়ের গাড়িচালক মোঃ বিপ্লব হোসেনের নামে। শোকপ্রস্তাবে তাঁর একটা বর্ষভিত্তিক জীবনবৃত্তান্ত টেনে বলা হয়েছে, ব্যক্তি হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক, ভদ্র, নম্র, সহানুভূতিশীল, সৎ, নিষ্ঠাবান ও সাদাসিধা জীবনের অধিকারী। ধৈর্য, সাহস, মনোবল, আত্মবিশ্বাস ও কষ্টসহিষ্ণুতার দিক দিয়েও তিনি ছিলেন অতুলনীয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন মানুষ। তিনি ছিলেন প্রকৃত এক মানবতাবাদী। শোকপ্রস্তাবের শেষে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, শিক্ষক ও নিবেদিতপ্রাণ সমাজসেবক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। শোকপ্রস্তাবের সবচে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছর পর মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নাম জাতীয় সংসদ সঠিক উচ্চারণ ও বানানে প্রকাশ করতে পেরেছে। কারণ ১৯৭২ সনের জাতীয় সংসদ অধিবেশনে তাঁকে বারবার 'মানবেন্দ্র নাথ লারমা' ডাকা হতো। এ নিয়ে বারবার সংশোধনও করেছিলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা।

১৯৩৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ারচর থানার বুড়িঘাট মৌজার মাওরুম (বাঙালিরা যে গ্রামের নাম দিয়েছে মহাপুরম) আদামে জন্মগ্রহণ করেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। বর্তমানে এই গ্রামজনপদ কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্পের কৃত্রিম বাঁধের তলায় ডুবে গেছে। সুভাষিণী দেওয়ান ও চিত্ত কিশোর চাকমার চার সন্তানের ভেতর মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তৃতীয়। মহাপুরম জুনিয়র হাই স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি ১৯৫৮ সালে রাঙামাটি সরকারি কলেজ থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৬০ সালে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে আইএ পাশ করেন। ১৯৬৬ সালেই খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালার দীঘিনালা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে যোগদান করেন। ১৯৬৮ সালে চট্টগ্রাম রেলওয়ে কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং বিএড পরীক্ষা দেন। ১৯৬৯ সালে এলএলবি পাশের পর চট্টগ্রাম বার এসোসিয়েশনের আইনজীবী হিসেবে যোগদান করেন।

> একজন চাকমা কি কোল বা লালেং কি কড়া বা কন্দ কি মুন্ডা বা কোচ যে কোনোভাবেই 'বাঙালি' নয়, এটি রাষ্ট্র তার নথি ও কাঠামোগত জায়গাতে বুঝতে চাইছে না। রাষ্ট্র জোর করে পরিচয়ের অন্যায় ব্যাকরণ চাপিয়ে দিচ্ছে অবাঙালি জনগণের উপর। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা প্রথম রাষ্ট্রের কাছে আত্মপরিচয় নিয়ে কাঠামোগত বিশ্লেষণ এবং বিতর্ক তুলে ধরেন। ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে দেশের সকল জাতিদের একত্রে 'বাঙালি' হিসেবে আখ্যায়িত করার প্রতিবাদে গণপরিষদ অধিবেশন বর্জন করেন। রাষ্ট্র 'আদিবাসী' প্রত্যয়টি কাঠামোগত স্বীকৃতি না দিলেও সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে 'উপজাতি', 'নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী', 'সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী', 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা', 'ট্রাইবাল', 'এবরিজিনাল' এরকম বৈষম্যমূলক পরিচয়গুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

১৯৫৬ সনেই ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেন, ১৯৫৭ সনে অনুষ্ঠিত প্রথম পাহাড়ি ছাত্র সম্মেলনের একজন কেন্দ্রীয় উদ্যোক্তাও ছিলেন তিনি। ১৯৫৮ সনে পূর্ব পাকিস্থান ছাত্র ইউনিয়নে যোগদান করেন। ১৯৬০ সনে পাহাড়ি ছাত্র সমাজের নেতৃত্বদানের পাশাপাশি ১৯৬১ সনেই কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৬২ সনে সংগঠিত করেন এক বিশাল পাহাড়ি ছাত্র সম্মেলন। চট্টগ্রামের পাথরঘাটাস্থ পাহাড়ি ছাত্রাবাস থেকে ১৯৬৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি তাকে বিশেষ নিবর্তনমূলক আইনে আটক করে সরকার। ১৯৬৫ সালের ৮ মার্চ বিশেষ শর্তসাপেক্ষে তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়। ১৯৭০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠনে দায়িত্বপালন করেন এবং এই সনেই পূর্ব পাকিস্থান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট পার্বত্য অঞ্চলের আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে চার দফা দাবি পেশ করেন।

১৯৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠন করেন এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে দেশের সকল জাতিদের একত্রে 'বাঙালি' হিসেবে আখ্যায়িত করার প্রতিবাদে গণপরিষদ অধিবেশন বর্জন করেন। ১৯৭৩ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালে সরকারের পালামেন্টারি প্রতিনিধি হিসেবে কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে লন্ডন সফর করেন। ১৯৭৪ সালে বাকশালে যোগদান করেন। ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট থেকে আত্মগোপন করেন। ১৯৭৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রথম সম্মেলনের মাধ্যমেও পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৮২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির দ্বিতীয় সম্মেলনের মাধ্যমেও সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর ভোররাতে বিভেদপন্থী ভবতোষ দেওয়ান (গিরি)-প্রীতি কুমার চাকমা (প্রকাশ)-দেবজ্যোতি চাকমা(দেবেন)-ত্রিভঙ্গিল দেওয়ান (পলাশ) চক্রের বিশ্বাসঘাতকতামূলক অতর্কিত আক্রমণে পার্টির আটজন নেতাসহ নির্মমভাবে নিহত হন। একই দিনে নিহত হন তাঁরই অগ্রজ শুভেন্দু প্রভাস লারমা (বুলু) এবং পরবর্তীতে তাঁর ছোট ভাই জ্যোতিরিন্দ্রি বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু) সংগঠনের দায়িত্ব পালন করছেন। ১৯৭১ সালে পংকজিনী চাকমার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁদের এক পুত্র জয়েস লারমা এবং এক কন্যা পারমিতা লারমা। এম এন লারমা এবং পংকজিনী লারমা উভয়েরই ডাক নাম মঞ্জু। কাপ্তাই বাঁধের ফলে জন্মগ্রাম তলিয়ে গেলে খাগড়াছড়ির পানছড়িতে আশ্রয় নেয়ার পর মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নামে পানছড়ি উপজেলার একটি গ্রামের নাম হয় মঞ্জু আদাম।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সবসময়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু নিদারুণভাবে তাঁর নামে একটি মহাসড়ক বা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের নামকরণও হয়নি কিংবা ঘোষিত হয়নি তাঁর নামে কোনো জাতীয় স্মারক পদক। এমনকি আমাদের পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত হয়নি তাঁর জীবনকর্ম কিংবা মূলধারায় তাঁর চিন্তা-দর্শন-কর্মপ্রক্রিয়া নিয়ে খুব বেশি আলাপ বা তৎপরতাও দৃশ্যমান নয়। দীর্ঘদিন যাবত তাকে 'চাকমা' হিসেবে 'আদিবাসী প্যাকেজ মোড়কে' বন্দী করে আড়াল ও অপর করে রাখবার প্রশ্নহীন প্রক্রিয়া চালু ছিল। খুব বেশি দিন হবে না, হয়তো গত মাত্র ১০/১৫ বছরে তাঁর চিন্তা-দর্শন-রাজনীতি নিয়ে মূলধারায় কিছুটা আলাপ শুরু হয়েছে। তবে তাও খুব যথেষ্ট নয়, মূলত তাঁর মৃত্যু ও জন্মদিবসকে কেন্দ্র করেই। কেবল বাঙালি সমাজ নয়, আদিবাসী বা এমনকি চাকমাদের নতুন প্রজন্মও তাঁর সম্পর্কে খুব বেশি ওয়াকিবহাল নয়।

এই দীর্ণ অবস্থা স্পষ্টতই রাষ্ট্রের অস্বীকৃতির সংস্কৃতি এবং জাত্যাভিমানী বর্ণবাদী চরিত্রকে প্রকাশ করে এবং এর ভেতর দিয়ে এক বিকশিত এক বৈষম্যের ময়দান চাঙ্গা হয়ে ওঠে। প্রশ্নহীন আঘাত আর বৈষম্যের লম্বা ফিরিস্তিকে টেনেই ক্রমশই জিডিপির সূচকে উন্নতির শিখর স্পর্শ করছে দেশ। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর এই গৌরবদীপ্ত টগবগে সময়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কতখানি জরুরি? তাঁর চিন্তা-দর্শন-রাজনীতি ও কর্মউদ্যোগ স্বাধীনতার এই সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমরা কীভাবে পাঠ করবো? কেন তিনি এখনো প্রাসঙ্গিক? সমাজ ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক রূপান্তর প্রক্রিয়ায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এখনো আমাদের কী দিকনির্দেশনা দিতে পারেন? স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা জরুরি। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে নতুন প্রজন্মের সামনে বহুমুখী সৃজনশীল কায়দায় উন্মুক্ত ও উপস্থাপন করা জরুরি। চলতি আলাপে আমরা খুব সংক্ষেপে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার কিছু উল্লেখযোগ্য চিন্তা-দর্শন ও কাজকে আলাপে টানবো। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গড়ন, গঠন এবং সামগ্রিক রূপান্তরে এই দর্শন এক মৌলিক জিজ্ঞাসা ও চিন্তাবীজ হিসেবে এখনো জরুরি হয়ে আছে।

আত্মপরিচয় বিতর্ক

আত্মপরিচয় ঘিরে রাষ্ট্রের জাত্যভিমানী দেনদরবার দেশের জাতিগত নিম্নবর্গের 'জাতীয়তার নির্মাণ-বিনির্মাণ' প্রশ্নে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে আরো জটিল হয়েছে। হয়েছে বৈষম্যমূলক। একজন চাকমা কি কোল বা লালেং কি কড়া বা কন্দ কি মুন্ডা বা কোচ যে কোনোভাবেই 'বাঙালি' নয়, এটি রাষ্ট্র তার নথি ও

কাঠামোগত জায়গাতে বুঝতে চাইছে না। রাষ্ট্র জোর করে পরিচয়ের অন্যায় ব্যাকরণ চাপিয়ে দিচ্ছে অবাঙালি জনগণের উপর। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা প্রথম রাষ্ট্রের কাছে আত্মপরিচয় নিয়ে কাঠামোগত বিশ্লেষণ এবং বিতর্ক তুলে ধরেন। ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে দেশের সকল জাতিদের একত্রে 'বাঙালি' হিসেবে আখ্যায়িত করার প্রতিবাদে গণপরিষদ অধিবেশন বর্জন করেন। রাষ্ট্র 'আদিবাসী' প্রত্যয়টি কাঠামোগত স্বীকৃতি না দিলেও সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে 'উপজাতি', 'নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, 'সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী', 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা', 'ট্রাইবাল', 'এবরিজিনাল' এরকম বৈষম্যমূলক পরিচয়গুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

উন্নয়ন বনাম জীবন

বৃহৎ বাঁধসহ করপোরেট খনন কী বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণ বিশেষ করে দুনিয়াজুড়ে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে উদ্বাস্তু করে। বাংলাদেশেও ষাটের দশকে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রায় লাখো মানুষের পরিবারকে বাস্তুচ্যুত করেছিল। বন্যপ্রাণী, পাহাড়, বৃক্ষলতা হয়েছিল নিরুদ্দেশ। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৯৬১ সনেই কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬২ সনে সংগঠিত করেন এক বিশাল পাহাড়ি ছাত্র সম্মেলন। চট্টগ্রামের পাথরঘাটাস্থ পাহাড়ি ছাত্রাবাস থেকে ১৯৬৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি তাকে বিশেষ নিবর্তনমূলক আইনে আটক করে সরকার। ১৯৬৫ সালের ৮ মার্চ বিশেষ শর্তসাপেক্ষে তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়। কাপ্তাই বাঁধের বিরোধীতার মাধ্যমে মূলত মানবেন্দ্র আমাদের সামনে কেবল উন্নয়নকে প্রশ্ন করেননি, বা এটি কেবলমাত্র পরিবেশ সুরক্ষার প্রশ্নও নয়, বরং তিনি প্রাণ ও প্রকৃতিবান্ধব উন্নয়নের প্রশ্নটিকে জোরালো করেছিলেন।

কৃষি ও ভূমিপ্রশ্ন

যে কৃষি এবং জুমের সাথে এই জনপদের মানুষের উৎপাদন ও মালিকানা সম্পর্ক সেইসব বিষয়ের প্রতি রাষ্ট্রীয় আইনগত মনোযোগ স্পষ্ট করার আহ্বান জানিয়েছিলেন এম এন লারমা। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত দেশের প্রথম বাজেট আলোচনায় এম এন লারমা দেশের জনগণের উৎপাদন সম্পর্কের বিষয়ে বাজেটকে প্রশ্ন করেন এবং কৃষকের জায়গা থেকে বাজেটের আলোচনা তুলে ধরেন। এম এন লারমা সংসদীয় বিতর্কে তুলে ধরেছেন কৃষিভূমির সংস্কারের প্রসঙ্গগুলোও, বারবার উত্থাপিত হলেও যা রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় মনোযোগে হারিয়ে যায়, হয়ে উঠে অনস্তিত্বশীল। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কৃষিজমির সমবায় মালিকানা ও বন্টনের কথা উত্থাপন করেছিলেন রাষ্ট্রসভায় যদিও এই উত্থাপনের দিকে জাতীয় সংসদের গুরুত্ব ছিল না। কৃষকের উপর রাষ্ট্রীয় খাজনার চাপ এবং রাষ্ট্র কিভাবে খাজনাভিত্তিক আইনের ভেতর দিয়ে সকল শ্রেণি বাস্তবতার কৃষককে এক করে ফেলে এই জায়গা গুলোও লারমা তুলেছিলেন। বলেছিলেন, ... রাষ্ট্রীয় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে শিক্ষা, কৃষি, দেশরক্ষা এবং তারপর হচ্ছে শিল্প। রাজস্ব বা খাজনাই কেবলমাত্র নয়, কৃষিভূমি সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিকেও প্রশ্ন করেছেন এম এন লারমা। ভূমি অধিকারের ক্ষেত্রে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ মত ছিল, রাষ্ট্রীয় প্রজাস্বত্ত্ব ও ভূমি অধিগ্রহণ আইনের সংশোধন। লারমা তাই এ প্রসঙ্গসমূহ উল্লেখ করেছেন রাষ্ট্রসভায়, ...আজকে রাজস্ব আদায়ের যে ব্যবস্থাপনা সেটা যদি পর্যালোচনা করা যায়, এই প্রশ্ন এসে যায় যে, সত্যিকারভাবে কৃষকদের শোষণ থেকে মুক্ত করা হয়েছে কিনা।

জুম বিতর্ক

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তার জীবনকালে পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী জনগণের জুমচাষের বিকাশ ও বিস্তার বিষয়ে সর্বদা তৎপর ছিলেন। ১৯৬৬ সালে দীঘিনালায় শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনের সময়েও তিনি স্থানীয় জুমিয়াদের এ বিষয়ে সময় দিয়েছেন। জুম ধানের বৈচিত্র্য সংরক্ষণে সোচ্চার থেকেছেন। পাহাড়ের গ্রামে গ্রামে নানান আলোচনা ও কাজের ভেতর খুকিবিনি, হাইরেনাচন বিনি, মনভোগবিনি, কালা খবরক, সাদা খবরক, লাল গ্যাল্লুং, সাদা গ্যাল্লুং, চিকন গ্যাল্লুং, গুড়ি গ্যাল্লুং, রাঙাপানি, চানমনি, হাল্যোজিরে, লুদিসেল, সিনেল, গজ্যা, গঞ্জালি, বাচ্চুপুদি, কামারাং, ছুরি এরকমের চাকমা জুমধানগুলির সত্তা ও সম্ভাবনা সুরক্ষায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সময় দিয়েছেন বিস্তর। জুমচাষ হলো দেশের পাহাড় বা অরণ্য অঞ্চলের বাঙালিভিন্ন আদিবাসী জনগণের এক ঐতিহাসিক উৎপাদন সংস্কৃতি রাষ্ট্র যা বন্ধ করবার জন্য চাপ ও নিয়ন্ত্রণ জারি রেখেছে। জুম নিয়ে ঔপনিবেশিক আঘাত সম্পর্কে আমরা কমবেশী জানি। জুমনিয়ন্ত্রণ বনবিভাগ বা 'জুমচাষ পরিবেশের ক্ষতি করে' এই ধরনের প্রশ্নহীন প্রচারণা পাহাড়ে পাহাড়ে চারপাশ জুড়ে। জুম নিয়ন্ত্রণ এবং জুমের সীমানা দখল হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি সর্বাধিক প্রান্তিক হয়েছে জুমিয়া জীবন। এমএন লারমা রাষ্ট্রসভার প্রথম কোনো জনপ্রতিনিধি যিনি রাষ্ট্রের জুমকেন্দ্রিক জনগণের উৎপাদন সম্পর্ক নিয়ে বাহাস তুলেছেন, আইনগত অধিকারের দাবি তুলেছেন।

উন্নয়নের মূলধারায় প্রান্তজন

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বারবার দেশের প্রান্তজনের আয়নায় রাষ্ট্রকে প্রশ্ন করেছেন, প্রস্তাব তুলে ধরেছেন। হরিজন, বেদে, ভিখারি, কারখানার মজুর, রিকশাচালক, যৌনকর্মী সকলের কথাই তিনি জোরদারভাবে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। ১৯৭৪ সনের গণপরিষদে জাতীয় বাজেট বক্তৃতার বিবরণী পাঠ করা যাক। সেসময় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাই দেশের প্রথম

জনপ্রতিনিধি যিনি বেদেসহ সকল বঞ্চিত মানুষের কথা সংসদে উত্থাপন করেছিলেন এবং তাদের উন্নয়নে বিশেষ বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করেছিলেন। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সেদিনের প্রস্তাব জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়নি, তখনকার কোনো সাংসদই তাকে সমর্থন করেননি। তাকে তিরস্কার করা হয়েছে। কিন্তু বিস্ময়করভাবে রাষ্ট্র দীর্ঘসময় পরে বেদে, হিজড়া, দলিতসহ সকল প্রান্তজনকে দেশের মূল উন্নয়ন ধারায় যুক্ত করতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে। নথি ও বাজেটে বিশেষ মনোযোগ ও বরাদ্দ তৈরি করেছে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বনাম মেহনতি মজদুর

পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে মেহনতি নিম্নবর্গের বিপ্লব কাঁপিয়ে দিয়েছিল ১৯১৭ সনের রাশিয়াসহ এক শৃংখলিত দুনিয়াকে। বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জন্ম অক্টোবর বিপ্লবের ২২ বছর পর। কিন্তু তাঁর বেড়ে ওঠার ভেতর দিয়েই তিনি সক্রিয়ভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। প্রশ্ন তুলেছেন। বৈশ্বিক পুঁজিবাদ, অর্থনৈতিক ধারা এবং রাষ্ট্রের রাজনৈতিক শ্রেণিচরিত্র সম্পর্কে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ভাষ্য বারবার জানান দেয় তিনি মেহনতি মজদুর জনগণের ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠায় সাহসী উচ্চারণ করেছেন বারবার। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সংসদে বলেছিলেন, ... মাননীয় স্পীকার সাহেব, আজ যে সংবিধান এই মহান গণপরিষদে গৃহীত হবার শেষ পর্যায়ে রয়েছে, সেই সংবিধানে বলা হয়েছে যে, গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের উত্তরণ হবে আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশে। মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র হবে, দেশে অভাব থাকবে না, হাহাকার থাকবে না, মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না, হিংসা, দ্বেষ, বিদ্বেষ... কিছুই থাকবে না। শুধু থাকবে মানুষে মানুষে প্রেম, প্রীতি, মায়া, মমতা এবং তার দ্বারা এক নতুন সমাজ গড়ে উঠবে। মানবতার এই ইতিহাস থাকবে এবং তাতে লেখা থাকবে 'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই।' আমি আজ কামনা করি, তাই হোক। আজ এই সংবিধান যাদের রক্তে এল, তাঁদের কথা যেন ভুলে না যায়। অতীতের ভুলের ইতিহাস, অতীত ইতিহাসের অভিজ্ঞতা, অতীতের মানব সভ্যতা, মানুষের ত্যাগ তিতিক্ষার যে সংগ্রাম, আজ এই সংবিধানে তা সন্নিবেশ করে আমাদের ইতিহাস বিশ্বের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, যাতে আমাদের এই ইতিহাস বিশ্বের মধ্যে অনন্য হয়ে থাকতে পারে।

পাহাড়ের মুক্তি

পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রশ্নহীন বলপ্রয়োগের এক 'বিশেষ চিহ্নিত' সীমানা। যে সীমানাকে অবহেলা আর ঐতিহাসিক কায়দায় অনস্তিত্বশীল করে তোলার ভেতর দিয়েই পার্বত্য চট্টগ্রাম আমাদের কাছে এক বিশেষ পরিসর। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পার্বত্য এলাকার একজন হিসেবে রাষ্ট্রমহলে পয়লা রাষ্ট্রের এইসব অনিবার্য দাপটকে প্রশ্ন করে দাঁড়ান প্রাতিষ্ঠানিক কায়দায়। অবধারিত এই প্রক্রিয়াকে প্রশ্ন করার যে বিচার বিশ্লেষণ ও সাহস মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বেঁচে থাকার জীবনে ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল, যে ঝিলিক রাষ্ট্রের নিপীড়িত জনগণের মুক্তির প্রসঙ্গকে রাষ্ট্রমহলে টানার সাহস করেছিল। ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট পার্বত্য অঞ্চলের আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে চারদফা দাবি পেশ করেছিলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। পরবর্তীতে এক দীর্ঘ সংগ্রামী সময়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সনে রাষ্ট্র পার্বত্যচুক্তির মাধ্যমে পাহাড়ে 'শান্তি প্রতিষ্ঠার' সক্রিয় উদ্যোগ নিতে বাধ্য হয়।

নারী মুক্তি

এম এন লারমা সংসদ অধিবেশনে প্রথম রাষ্ট্রের সংবিধানে 'নারীর জন্য স্পষ্ট কোনো অধিকারের জায়গা নাই' এমন একটি বাহাস তুলেছিলেন। পুরুষতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধানকে পুরুষতান্ত্রিক হিসেবে পাঠ করার এই আদিগন্ত সাহস মানবেন্দ্রের লিঙ্গীয় রাজনীতি সম্পর্ককেও স্পষ্ট করে তুলে। এম এন লারমা লিঙ্গীয় পরিসরকে আরো শ্রেণিবিভাজনের জায়গা থেকেও দেখতে চেয়েছেন। তিনি সংসদে বলেছেন, ... তারপর আমি বলব, সবচেয়ে দুঃখজনক কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের মা-বোনদের কথা এখানে নাই। নারীর যে অধিকার সেটা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। নারীকে যদি অধিকার দিতে হয়, তাহলে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে, সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে। কারণ, তারাও সমাজের অর্ধেক অংশ।

মাতৃভাষা প্রসঙ্গ

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষা শিক্ষার অধিকারের বিষয়টি প্রথম রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০ সকল আদিবাসী জাতির ভাষা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের কথা স্বীকার করেছে। ২০১২ সনে চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, মান্দি, ত্রিপুরা ও ওঁরাও আদিবাসীদের মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের একটি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ তৈরি হয়। কিন্তু এই পরিস্থিতি দেশ স্বাধীনের পর এমন ছিল না। বাংলা ছাড়া দেশে প্রচলিত অপরাপর মাতৃভাষার প্রসঙ্গ সবসময়ই আড়াল করে যাওয়া হয়েছে। যদিও দীর্ঘসময় পরে রাষ্ট্র সকল মাতৃভাষার মর্ম উপলব্ধি করবার সাহস করছে। আর এটি সম্ভব হয়েছে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার কারণেই। তিনিই প্রথম সংসদে দেশের বাংলা বাদে অন্যান্য আদিবাসী ভাষা নিয়ে রাষ্ট্রের পরিকল্পনা, উন্নয়নচিন্তা বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন।

পরিবেশ প্রশ্ন ও প্রকৃতিপ্রেম

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এক কেন্দ্রীয় পরিবেশপ্রশ্নের ভেতর

দিয়েই তার জিজ্ঞাসাগুলো তুলে ধরেছেন বারবার। এছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমী। তার সাংগঠনিক অনেক কাজে কর্মী ও প্রতিনিধিদের নানাভাবে পরিবেশ প্রশ্নে দায়বদ্ধ হতে তিনি বাধ্য করেছেন, তাদের ভেতর পরিবেশ সুরক্ষার চর্চা গড়ে তুলেছেন। একটা পাহাড়, বনভূমি বা প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র থেকে কতখানি প্রাকৃতিক সম্পদ কীভাবে আহরণ করা জরুরি এই পরিবেশগত নীতিশিক্ষা তিনি চালু করেছিলেন তার নিজের সংগঠনে।

আজ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার উত্থাপিত প্রশ্ন, দর্শনচিন্তাসমূহ বাংলাদেশের সামগ্রিক রূপান্তর প্রক্রিয়ায় খুব জরুরি ও প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায়। জানা যায়, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য এমএন লারমার ১৯৬৯-১৯৭১ এর সময় রাঙ্গামাটির কন্ট্রাক্টর পাড়ার শেষ মাথায় একটা বাঁশের বেড়া, শণের ছানি অতি সাধারণ মাটির ঘর ছিল। এই ঘরেই তিনি সপরিবারে বাস করতেন। এই ঘরেই জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তাঁর কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধা নিয়ে মানুষ আসতেন। ঘরের মেঝেতে পাটি বিছিয়ে হাসি মুখে তিনি সকলকে আতিথেয়তা দিতেন। তাঁর ঘরে কোনো কাঠের সোফা এমনকি কাঠের চেয়ার পর্যন্ত ছিল না। পাটিতে বসেই মানুষের সমস্যার কথা শুনতেন। পাহাড়ি অতিথিদেরকে বাজ-দাবা (বাঁশের হুক্কা) আর পান সুপারি দিয়ে আপ্যায়ণ করা হত। একজন মানুষ, একজন কর্মী, একজন রাজনীতিক এবং একজন সমাজ পরিবর্তনকারী হিসেবে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার দর্শনচিন্তাই কেবল উপযোগী নয়, তাঁর কম কার্বনভিত্তিক জীবনযাপন আজকে এই দুঃসহ জলবায়ু সংকটের দুনিয়ায় খুব বেশি উপযোগী এবং গ্রহণযোগ্য। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে দাঁড়িয়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আমাদের কাছে এমনি অজস্র জিজ্ঞাসা আর অনুশীলনসমেত এক গর্বিত উদাহরণ। আজকের তরুণ প্রজন্ম চাইলে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে পাঠ করতে পারে, বাংলাদেশের রূপান্তরে তাঁর চিন্তাবীজ ও অনুশীলন থেকে শক্তি ও কারিগরি নিয়ে দেশকে বাহাত্তরের সংবিধানের সত্যিকার আবহে সাজাতে পারে।

লেখক ও গবেষক, ই-মেইল: animistbangla@gmail.com

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতৃবৃন্দ রাঙ্গামাটিতে শহীদ বেদীতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করছেন

পার্বত্য চুক্তি নিয়ে তাত্ত্বিক ভাবনা : ফিরে দেখা বিগত ২৫ বছর

অনুরাগ চাকমা

কালজয়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৫ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। কিন্তু শুরুতেই প্রশ্ন থেকে যায়, পাহাড়ি-বাঙালি নির্বিশেষে পাহাড়ের মানুষ চুক্তির অনেক বছর পরে কি পেয়েছে আর চুক্তি মোতাবেক এখনো কি পায়নি। সরকারের মতে, পার্বত্য চুক্তির অধিকাংশ ধারা বাস্তবায়ন হয়েছে। চুক্তির অপরপক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি দাবি করে ৭২টি ধারার মধ্যে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ বাস্তবায়ন হয়েছে, বিশেষ করে চুক্তির মৌলিক ধারাসমূহ এখনো বাস্তবায়ন হয়নি।

পার্বত্য চুক্তির উভয়পক্ষের হিসাব বাদ দিলে, চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে জনগণের হিসাব কি বলছে? বিগত সময়ের গবেষণা কি বলছে? পৃথিবীর শান্তি চুক্তি নিয়ে গবেষণা করা একাডেমিক জগতে স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রোক ইনষ্টিটিউটের মতে, পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়নের হার মাত্র ৪৯%। আপনারা এই গবেষণার তথ্য-উপাত্ত চ্যালেঞ্জ করতে পারেন, সেটা গবেষণাতে হতেই পারে, কিন্তু আমাদের ততক্ষণ পর্যন্ত এই গবেষণার ফলাফলকে বিশ্বাস করতে হবে যতক্ষণ আমরা আরেকটা নতুন গবেষণার তথ্য-উপাত্ত দিয়ে আলোচনায় না আসি।

> ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ক গ্রুপ ফর ইন্ডিজিনাস এ্যাফেয়ার্স (ইবগিয়া), এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, কাপেং ফাউন্ডেশন, আন্তর্জাতিক পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন এবং ডি'কোস্টা, জামিল ও পান্ডা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক এবং গবেষকদের মতে, পার্বত্য চুক্তি প্রত্যাশা অনুযায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। কারণ মানবাধিকার লঙ্ঘন, নারীর প্রতি সহিংসতা, আদিবাসীদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ, বনভূমি ধ্বংস, পাহাড় কাটা, পাথর উত্তোলনসহ পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি করা হচ্ছে। ইবগিয়া-এর মতে, ২০০৪-২০১১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে মন্দির ভেঙে দেয়া, বিনা অপরাধে গ্রেফতার এবং আদিবাসী নারী ধর্ষণসহ ১,৪৮৭টি বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। ফেরত যেতে পারেনি।

বিগত ২৫ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চুক্তি নিয়ে অনেক গবেষণাধর্মী বই এবং নামী-দামী জার্নালে কমপক্ষে হলেও কয়েক ডজন গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। অধিকাংশ গবেষণায় পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন নিয়ে অসন্তোষজনক ফলাফল এসেছে। আমরা হয়তোবা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র বক্তব্যকে সাম্প্রদায়িক, দলীয় এবং রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট হিসেবে প্রত্যাখান করতে পারি, কিন্তু অনেক গবেষণার ফলাফল কিভাবে উড়িয়ে দিতে পারি?

আমি আমার পিএইচডি গবেষণায় জানার চেষ্টা করছি, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক পন্থায় সরকারের নেতৃত্বের পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের পরিবর্তন কিভাবে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে (ইতিবাচকভাবে এবং নেতিবাচকভাবে) প্রভাবিত করতে পারে। বিগত নয়টি মাসেলিটারেচার রিভিউ করতে গিয়ে শান্তিচুক্তি নিয়ে অনেক গবেষক এবং স্কলারদের নানা ধরনের বিশ্লেষণ জানার সৌভাগ্য হয়েছে এবং আমি আমার লিটারেচার রিভিউর সামান্য অংশ তুলে ধরলাম।

ফেয়ারন, হ্যাম্পসন, জর্স্ট্যাড এবং নিলসন, বিয়ার্ডসলি এবং অনেক স্কলার তাদের গবেষণায় শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক উপাদানের (যেমন, গণতন্ত্রের ভূমিকা, চুক্তির ধরন, চুক্তিবিরোধী অপশক্তির ভূমিকা, বিদেশী রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা ইত্যাদি) প্রভাব নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। ব্রুনবার্গ এবং উর্ডাল, কোলিয়ার এবং হোফলার, মুর্শেদ এবং গেটস, স্টুয়ার্ট, গ্রাহাম এবং ল্যাঙ্গার-সহ অনেক স্কলার গবেষণা করে দেখেছেন কিভাবে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কারণ (যেমন, দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনা এবং মানব উন্নয়ন ইত্যাদি) শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করে।

অন্যদিকে ব্রুনবার্গ এবং উর্ডালদের মতে, জনসংখ্যার চাপ এবং বহিরাগতদের বসতি স্থাপন শান্তি প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। ডু এ্যান্ড আইয়ার-দের বিশ্লেষণ অনুসারে, জাতিগত বিভেদের কারণে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাবেও শান্তি প্রক্রিয়া ধূলিসাৎ হতে পারে। সংক্ষিপ্ত করে বলব, কেন অনেক দেশে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন হয়েছে আর

কেন অনেক দেশে শান্তি চুক্তি ব্যর্থ হয়েছে, এ নিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শত শত গবেষণা হয়েছে।

তাই চুক্তি নিয়ে অনেক ধরনের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিয়ে আসা যায়। কিন্তু আমি আমার আলোচনার সীমারেখা টানব একটি তাত্ত্বিক জায়গায়, সেটা হল জোহান গালতুং-এর নেগেটিভ-পজিটিভ পিস ধারাণা (নেতিবাচক- ইতিবাচক শান্তি)। এই তাত্ত্বিক ধারণার মূল বক্তব্য হল, একটি দেশে কিংবা একটি অঞ্চলে নেগেটিভ পিস (সশস্ত্র সহিংসতার অনুপস্থিতি) বিদ্যমান আছে কিন্তু পজিটিভ পিস যেমন মানবাধিকার লঙ্ঘন, দারিদ্র্য, জাতিগত-ধর্মীয় বৈষম্য, নারীর প্রতি সহিংসতা এবং পরিবেশের বিপর্যয় চলমান আছে। আমরা কি সেই রাষ্ট্র কিংবা সমাজকে 'শান্তিপূর্ণ' বলতে পারব?

আমি এই লেখায় পার্বত্য চুক্তিকে কেবলমাত্র নেগেটিভ-পজিটিভ পিস তাত্ত্বিক ধারণা দিয়ে এবং সঙ্গতিপূর্ণ বিদ্যমান গবেষণার রেফারেন্সের আলোকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। তবে এটা বলে রাখা দরকার, গঠনমূলক চিন্তাবাদী (কনস্ট্রাক্টিভিস্ট)-দের মতে, সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণা এবং বিশ্লেষণ শুধুমাত্র একটি বিষয়ের আংশিক সত্যকে উপস্থাপন করতে পারে এবং এই সত্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সত্য থেকে আলাদা। এ কারণে, যুক্তিতে ভরপুর তর্ক-বিতর্ক সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়সমূহকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং আমার এই আলোচনাটাও তাই বিতর্কের বাইরে যেতে পারে না।

প্রথমে আলোচনা করি নেগেটিভ পিস নিয়ে। একটি অঞ্চলে কিংবা দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ, সশস্ত্র সংঘাত-রক্তপাত বন্ধ হলে আমরা সেই সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থাকে 'শান্তিপূর্ণ' বলি। এবার আপনারা বলেন, আমরা কি পার্বত্য চট্টগ্রামে 'নেগেটিভ পিস' দেখতে পাই? পার্বত্য চুক্তির পরে দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে শান্তিবাহিনীর যুদ্ধ সমাপ্তি হয়েছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘাতের ধরন, কারণ, ফলাফল এবং প্লেয়ারের পরিবর্তন হয়েছে। একটি যুদ্ধের কবর রচনা হয়েছে, কিন্তু একই সাথে অনেক যুদ্ধের সূচনা হয়েছে, অনেক প্লেয়ারের জন্ম হয়েছে। চুক্তির পরে পাহাড়ের আঞ্চলিক দল নামধারী কতিপয় গোষ্ঠীগুলোর সংঘাতে ৫০০ জনের বেশি মৃত্যু হয়েছে এবং ১০০০ জনের বেশি অপহরণের শিকার হয়েছে।

অন্যদিকে অনেক উগ্র জাতীয়তাবাদী সংগঠনের (যেমন সমঅধিকার আন্দোলন, পার্বত্য বাঙালি গণ পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ) জন্ম হয়েছে যারা ভূমি সমস্যা এবং চুক্তির অপব্যাখ্যা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে চাঙ্গা করছে, যেটার প্রতিফলন আমরা চুক্তি-উত্তর অনেক সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনাগুলোতে দেখতে পাই। এর সাথে যুক্ত হয়েছে মায়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠী এবং রোহিঙ্গা সমস্যা। মোট কথা, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষদের একটা মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে : পাহাড়ে কারা (বিশেষ ব্যক্তি/রাজনৈতিক দল/ সরকারী সংস্থা) পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন আর পাহাড়ি-বাঙালিদের মধ্যে কারা শান্তি চায় না?

এখন আসেন পজিটিভ পিস প্রসঙ্গে। ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ক গ্রুপ ফর ইন্ডিজিনাস এ্যাফেয়ার্স (ইবগিয়া), এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, কাপেইং ফাউন্ডেশন, আন্তর্জাতিক পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন এবং ডি'কোস্টা, জামিল ও পান্ডা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক এবং গবেষকদের মতে, পার্বত্য চুক্তি প্রত্যাশা অনুযায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। কারণ মানবাধিকার লঙ্ঘন, নারীর প্রতি সহিংসতা, আদিবাসীদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ, বনভূমি ধ্বংস, পাহাড় কাটা, পাথর উত্তোলনসহ পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি করা হচ্ছে। ইবগিয়া-এর মতে, ২০০৪-২০১১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে মন্দির ভেঙে দেয়া, বিনা অপরাধে গ্রেফতার এবং আদিবাসী নারী ধর্ষণসহ ১,৪৮৭টি বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। তবে সবচেয়ে দুঃখজনক হল, সরকার জনসংহতি সমিতির সদস্যদের নিরাপত্তাসহ যথাযথ পুনর্বাসন করতে পারেনি। যার ফলে নিরস্ত্রীকরণ, নিষ্ক্রিয়করণ এবং পুনঃঅন্তর্ভুক্তিকরণ পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয়নি। অপরদিকে ভারত থেকে প্রত্যাগত শরণার্থীদের একটি বিশাল অংশ নিজেদের জমি ও বসতভিটায় ফেরত যেতে পারেনি।

সেই সাথে রয়েছে 'সামরিকীকরণের' সমস্যা। ব্রেথওয়েট এবং ডি'কোস্টা-দের পর্যবেক্ষণ তাদের গবেষণা প্রবন্ধ থেকে হুবহু তুলে ধরলাম: 'But the military proved a bad faith supporter of the peace. Once its objectives of surrender of most weapons, closure of the Tripura insurgent bases, and return of the JSS leadership to their martial control and surveillance was accomplished, successive military leaderships from 1998 to the present mobilised the political power of the military to defer, delay and ultimately deny implementation of key elements of the 1997 agreement. Initially, dozens of temporary military camps were closed in the CHT to implement the demilitarisation part of the agreement, but effective re-militarisation of the CHT was ultimately asserted with slightly fewer military and more police, intelligence and auxiliaries under military.'

দেশের এই অঞ্চলটা এতটা 'সামরিকীকরণ' করা হয়েছে, যেখানে চুক্তি পরিপন্থী 'অপারেশন উত্তরণ' চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতি দশজন মানুষের বিপরীতে একজন আইন-প্রয়োগকারী এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। এটার সাথে র‍্যাবের একটি ব্যাটালিয়ন যোগ হতে যাচ্ছে। আর কত? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বিভাগে একটিসেমিস্টারে ব্যারী বুজান-এর 'জনগণ, রাষ্ট্র ও ভয়' (পিপল, স্টেটস এ্যান্ড ফিয়ার) বইটি পড়িয়েছিলাম। ক্রিটিকেল সিকিউরিটি স্টাডিজ-এর স্কলারদের অন্যতম যুক্তি হল, রাষ্ট্র যখন নিরাপত্তা বাড়ায়, তখন জনগণের নিরাপত্তা কমে যায়। রাষ্ট্র কেবল তার জনগণের নিরাপত্তা দেয় না, সেই সাথে জনগণের নিরাপত্তার সমস্যাও তৈরি করে। বিভিন্ন সরকারের আমলে দেশের বিরোধী মতকে দমন তার একটি মাত্র উদাহরণ। তাই কেবল পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, গাজা, মিন্দানাও, পাটানি এবং আরাকানসহ বিশ্বের অনেক অঞ্চল প্রমাণ করে, রাষ্ট্রের "জাতীয় নিরাপত্তার" ধারণা কিভাবে 'স্থানীয় জনগণের নিরাপত্তাকে' ঝুঁকিপূর্ণ করতে পারে।

তবে এটাও আমাদের স্বীকার করতে হবে, বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি যে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, তা নিঃসন্দেহে বিশ্বের ইতিহাসে একটি কালজয়ী ইতিহাস। আমি বিশ্বের অনেক দেশের চুক্তি অধ্যয়ন করেছি, কিন্ত পার্বত্য চুক্তি আসলে একটি শ্রেষ্ঠ জাতীয় উপহার। কারণ এই চুক্তিতে সব কিছু যেমন রাজনৈতিক স্বশাসনের অধিকার, নারীদের অংশগ্রহণ, আদিবাসী ভূমি অধিকার, কর্মসংস্থানের অধিকার, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, পুলিশ এবং জনপ্রশাসন নিয়ে অনেক কিছু লেখা আছে। এরকম একটি শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক চুক্তি ২৫ বছরেও অনেকটা অকার্যকর থেকে যাবে, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভার সিদ্ধান্তবলী কেবল কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থেকে যাবে, একটি অথর্ব ভূমি কমিশনের বারান্দায় ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি ঝুলে যাবে, আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থাকে অকার্যকর/অথর্ব করে রাখা হবে, ভাবলে আক্ষেপ হয়! কারণ এই চুক্তি আমাদের আবেগের।

আমার মতো অনেকে জানেন, এই চুক্তি না হলে, পাহাড়ের বর্তমান প্রজন্মের অনেকে আজ হয়তোবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, ব্যাংকার, এনজিও কর্মকর্তা, ব্যবসায়ীসহ আর অনেক ধরনের সম্মানজনক সামাজিক অবস্থানে আসতে পারত না। আমি এটাও বলতে দ্বিধা করব না, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপক উন্নয়ন এবং আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থাসহ অনেক কিছু করেছে যদিও এখনো অনেক সমস্যা বিদ্যমান আছে। শেষ করব এই বলে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, পর্যটন কেন্দ্র এবং স্থল বন্দরসহ আমরা সব কিছু চাই, তবে সব কিছুর আগে চুক্তির ১০০ ভাগ বাস্তবায়ন জরুরি।

> দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া যে কত বড় মারাত্মক, তা বলে শেষ করা যায় না। দুর্নীতি যদি আমরা দূর করতে না পারি, তাহলে সরকার যত রকমের আইনই করুক না কেন, যত কড়া নির্দেশনামাই দিক না কেন, কোন সুরাহা হবে না। আজকে এই দুর্নীতি সবখানে। ..এই দুর্নীতিকে আঁকড়ে ধরে যারা কালো টাকা রোজগার করে, আইনের ছত্রছায়ায় তাদেরকে রক্ষা করা হয়। – *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

অতীতের সংগ্রামের ইতিহাস আগামী প্রজন্মের পথচলার অন্যতম পাথেয়

বি সি চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিতে বিশেষ করে '৮০ দশকে অত্যন্ত খারাপ অবস্থা বিরাজ করছিল। জুম্ম জনগণের উপর সেনাবাহিনীর অকথ্য নির্যাতন, নিপীড়নের নির্মম কাহিনি শুনলে শরীর শিউরে ওঠে। সেই সময় সেনাবাহিনী ও বহিরাগত মুসলমান সেটেলার উভয়ই একসাথে পাহাড়ের জুম্ম জনগণের উপর শকুনের মতোই হিংস্র থাবা ফেলেছিলো। পার্বত্য চট্টগ্রামে কলমপতি, ভূষণছড়া, লোগাং, পুজগাং, লংগদু, কাচালং ও নান্যাচর এলাকাসহ জুম্ম জনগণের গ্রামে গ্রামে অকথ্য নির্যাতন ও গণহত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিলো। সেই সময়ে সেনাবাহিনীর সাথে জুম্ম জনগণের সশস্ত্র সংঘাত বলবৎ থাকায় রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজমান ছিলো। এই অমানবিক নির্যাতনের লোমহর্ষক সংবাদ সংগ্রহ করা ছিলো অত্যন্ত কঠিন কাজ। সমতল থেকে সাংবাদিকরা পার্বত্য চট্টগ্রামে কী হচ্ছে প্রত্যক্ষভাবে এসে তা সংগ্রহ করা ছিল কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের উপর ছিল কড়া নজরদারি। যারা সংবাদ সংগ্রহ করার চেষ্টা করে তাদের চূড়ান্ত গোপনীয়তার সঙ্গে তা করতে হত। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের উপর সেনাবাহিনী বহিরাগত মুসলমান সেটেলার বাঙালিদের সাথে নিয়ে অকথ্য নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামে আসলেই কী চলছে তা পুরো বিশ্বই সেই সময় অবগত ছিলো না। কেবলমাত্র বাঙালি মুসলমান না হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের উপর শাসকগোষ্ঠী দমন-পীড়নের মাধ্যমে বিলুপ্তিকরণের নীতি হাতে নিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জাতিসমূহের উপর বাংলাদেশ শাসকগোষ্ঠীর অকথ্য নির্মম অত্যাচার ভাষাগত, সংস্কৃতিগত, লিঙ্গগত ও চেহারাগত পার্থক্যের কারণে শুধু নয়, বিশেষ করে ধর্মীয় পার্থক্যের কারণেও এই অমানবিক নির্যাতনের শিকার পাহাড়ের অসহায় নিপীড়িত মানুষ। অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করতে বাংলাদেশ শাসকগোষ্ঠীর এই হীন উদ্দেশ্য।

পাকিস্তান আমলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অপারেশন সার্চলাইট চালিয়ে দেশের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অসংখ্য মানুষকেও একই কায়দায় নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। এই সঠিক হিসাব হয়তো আমাদের মধ্যে না থাকলেও ন্যূনতম হিসাব অবশ্যই থাকবে। বিশেষ করে, ৮০ দশকে সেনাবাহিনীর অমানবিক অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রতিবেশী দেশ ভারতের মিজোরাম ও ত্রিপুরায় শরণার্থী হয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন পাহাড়ের হাজার হাজার জুম্ম জনগণ। বাস্তুচ্যুত হয়েছিলেন অসংখ্য জুম্ম পরিবার। সেই সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের হাজার হাজার জুম্ম জনগণ শরণার্থী হয়ে বেঁচে থাকার আশ্রয় খুঁজতে সীমান্তের ওপারে চলে যেতে বাধ্য হয়। জুম্ম জনগণের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সংগঠন জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে শাসকগোষ্ঠীর সকল প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের স্রোত বয়ে যায় পাহাড়ের চারিদিকে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় পার্টির নেতৃত্ব সব সময় সর্তক ও সোচ্চার থেকেছিল। পাহাড়ের ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণ শাসকগোষ্ঠীর এধরনের অন্যায়, অত্যাচার ও অমানবিক শোষণ-বঞ্চনাকে মেনে নিতে পারেনি, এই অন্যায়কে মেনে নিতে পারেনি বলে প্রতিরোধ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে অসংখ্য বিপ্লবী জুম্ম তরুণ।

৬০-৭০ দশকের অসংখ্য জুম্ম তরুণ মনে করে, বাংলাদেশ শাসকগোষ্ঠী যে অত্যাচার জুম্ম জনগণের উপর শুরু করেছে তা নিয়ে পাহাড়ের মানুষ আর চুপ করে বসে থাকবে না। অত্যাচারী শাসনের সামনে পাহাড়ের জুম্ম জনগণ কখনোই পরাজয় মেনে নেবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ৮০ দশকের সময় সবচেয়ে রক্তাক্তপূর্ণ ও উত্তপ্ত ছিলো। বাংলাদেশ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জুম্ম জনগণের ক্ষোভের আগুন তখন আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হচ্ছিল। আর সেই জুম্ম তারুণ্যের বিপ্লবী হৃদয়ের ক্ষোভের আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত হয়ে সমগ্র জুম্ম পাহাড়ের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছিলো। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও ক্ষোভের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন পাহাড়ের একজন বীর সেনানী মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের হাওয়া লেগেছে পাহাড়ের অসংখ্য জুম্ম তরুণের মনে।

প্রয়াতনেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও বর্তমান নেতা সন্তু লারমাদের জনপ্রিয়তা ছিল জুম্ম জনগণের সামনে আকাশচুম্বি যা সত্যিই অতুলনীয়। অতীতের মুঘল আমল, ব্রিটিশ আমল কিংবা পাকিস্তান আমলেই পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিলো। স্বাধীন বাংলাদেশ আমলেও ফের বঞ্চিত করা হয়েছে। বিন্দু বিন্দু জল যেমনি সিন্ধুতে পরিণত হয় তেমনি এই অসংখ্যবার বঞ্চনা ও ক্ষোভের আগুন পুঞ্জিভূত হয়ে পাহাড়ের বুকে তুষের আগুনে পরিণত হচ্ছিল। দীর্ঘ দুই যুগের অধিক সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যার বিস্ফোরণ ঘটেছে বলা যায়।

উল্লেখ্য যে, ৮০ দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের উপর শুরু হয়েছে নির্মম গণ-হত্যাকান্ড। প্রায় এক ডজনেরও অধিক এই গণহত্যা থেকে নারী-পুরুষ, শিশু কিংবা বৃদ্ধ কেউই রেহাই পায়নি। শতশত মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে।

গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হয়েছে। অসহায় দূর্গত জুম্ম জনগণের প্রতি ভারত সরকার মানবিক আশ্রয় দিতে আগ্রহী ছিলেন। বেঁচে থাকার তাগিদে ভারতের টেরিটোরিতে একটুখানি মানবিক আশ্রয়ের জন্য ছুটে আসা হাজার হাজার জুম্ম জনগণই বাংলাদেশ শাসকগোষ্ঠীর কাছে হয়ে গেল সেদিন সন্ত্রাসী, দেশদ্রোহী এবং ভারতপন্থী। এটাই বাংলাদেশ শাসকগোষ্ঠীর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া নীতির আসল দৃষ্টিভঙ্গি। দীর্ঘ দুই যুগের অধিক সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী গেরিলা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। বাংলাদেশ শাসকগোষ্ঠী ইচ্ছামত করে জুম্ম জনগণের অধিকার হরণ করবে, জুম্ম নারী ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা করবে, জুম্ম জনগণের জায়গা জমি জোরপূর্বক জবরদখল করে নেবে, জুম্ম জনগণের উপর অমানবিক হত্যাযজ্ঞ চালাবে এবং অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করতে সমতল অঞ্চল থেকে লক্ষ লক্ষ পাড়-ভাঙা, নদী ভাঙা মুসলমান সেটেলার বাঙালি ট্রাকের পর ট্রাকে করে নিয়ে এসে জুম্মদের জায়গাতে বসিয়ে দেবে আর জুম্মদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ করবে তা কখনোই মানবতার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। শাসকগোষ্ঠীর এই হীন ষড়যন্ত্র দেখার পর পাহাড়ের জুম্ম তরুণরাই সেদিন চোখ বন্ধ করে বসে থাকতে পারেনি, সময়ের দাবিতে এই জবাব ঠিকই দেওয়া হয়েছিলো।

৮০ দশকে পাহাড় ছিলো এক আতঙ্কের জনপদ। সেই ভয় ও আতঙ্ক পাহাড়ের মাথার উপর থেকে এখনও সরে যায়নি। পাহাড়ের জুম্ম তরুণরাও সেই সময়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকার পাত্র ছিল না, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে শুরু হয়েছে প্রতিরোধ সংগ্রাম। সশস্ত্র গেরিলা প্রশিক্ষণ নিয়ে গেরিলা কায়দায় জনসংহতি সমিতির সক্রিয় বিপ্লবী কর্মীরা আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। ব্যাপক জুম্ম ছাত্র ও যুব সমাজ সেই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। আন্দোলন চলাকালীন সময়ে রাত-বিরেতে জনসংহতি সমিতির সক্রিয় কর্মীরা যেদিকে মার্চ করেছেন, সেদিকে পাহাড়ের মানুষ শান্তিতে নিদ্রা লাভ করে মনের মধ্যে প্রশান্তি পেয়েছে। পাহাড়ের বুকে যেখানে চুরি-ডাকাতি, অসামাজিক কার্যকলাপ, অন্যায়, অবিচার সংঘটিত হয়েছে, সেখানেই জনসংহতি সমিতির সক্রিয় কর্মীরা এসে ধৈর্য ও সাহসের সাথে মোকাবেলা করে ন্যায়ের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে। এজন্যই এই সশস্ত্র গেরিলা বাহিনীকে জুম্ম জনগণ তাদের মন থেকে ভালবেসে নাম দিয়েছিল 'শান্তিবাহিনী'।

একদিকে বিশাল শক্তিধর রাষ্ট্রীয় বাহিনীর অসম শক্তির বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য লড়াই জারী রেখেছে, অপরদিকে জুম্ম সমাজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অসংখ্য প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতিবিপ্লবীদের বুঝিয়ে বলার পদ্ধতি অনুসরণ করে সত্য ও ন্যায়ের পথে ফিরিয়ে এনে সুন্দর সমাজ গড়ার বহুমুখী প্রক্রিয়ায় যুক্ত করেছে। এভাবে শান্তিবাহিনীর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, অসংখ্য জুম্ম তরুণদের সাহস, শক্তি, মনোবল, বীরত্ব, যুদ্ধের কায়দা-কৌশল ও আদর্শিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ন্যায় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার কাহিনি ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বের দুয়ারে-দুয়ারে। যার ফলে তখনকার সময়ে বাংলাদেশ শাসকগোষ্ঠীর ভিত নড়ে উঠেছিল। সেনাবাহিনীর প্রধান বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'আমরা রণ-ক্লান্ত, আমরা আর যুদ্ধ চাই না'। ধীরে ধীরে এক পর্যায়ে বাংলাদেশ শাসকগোষ্ঠীর সাথে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বের মধ্যেকার রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়।

এক সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সক্রিয় সদস্যসহ জুম্ম জনগণকে সরকার দেশদ্রোহী ও সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করতে চেয়েছিল। রাষ্ট্রযন্ত্র বা বাংলাদেশ শাসকগোষ্ঠী আজও সেই হীননীতি থেকে বিন্দুমাত্র সরে যায়নি। দীর্ঘ দুই যুগের অধিক সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সময়, জনসংহতি সমিতি জুম্ম জনগণকে সাথে নিয়ে রাষ্ট্রের সংবিধানের প্রতি অবিচল আস্থা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা, রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি অবিচল আনুগত্য পোষণ করে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই সংগ্রাম অব্যাহতভাবে চালিয়ে গেছেন। যুদ্ধের বাস্তবতা অনুসারে যুদ্ধরত যেকোনো পক্ষের সৈনিক কিংবা অফিসারের আত্মবলিদান ঘটবে তা অনিবার্য সত্য। সেই সময়কার যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর অফিসারকে বন্দী করে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখার সদস্য শান্তিবাহিনীরা বুঝিয়ে বলার পর সেনা অফিসারকে অক্ষত অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিলো এমন নজির ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে। পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চলে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে সেখানে দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' বলে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়েছে।

আমরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনোদিনই অস্ত্র কাঁধে তুলে নিইনি। আমরা অস্ত্র কাঁধে তুলে নিয়েছি একারণে যে, যুগ যুগ ধরে মোঘল আমল, ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমল পেরিয়ে অধুনা বাংলাদেশ আমলেও পশ্চাৎপদ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণকে নিজস্ব অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং আত্মপরিচয়ের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং বেঁচে থাকার মৌলিক মানবাধিকার হরণ করা হচ্ছে। আমরা বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করিনি, আমরা আন্দোলন করেছি উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে। আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিনি, আমরা আন্দোলন করেছি ইসলামি সম্প্রসারণবাদ ও ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে। আমরা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র কাঁধে তুলে নিইনি, আমরা অস্ত্র কাঁধে তুলে নিয়েছি নির্দয় সেনাশাসনের বিরুদ্ধে। আমরা

বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেনি, আমরা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের অধীনে স্বশাসন আদায়ের জন্য আন্দোলন করেছি। যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত দাবিতে পাহাড়ের মানুষ অস্ত্র কাঁধে তুলে নিয়েছিলো। এরপরেও কি বলবেন আমরা রাষ্ট্রদ্রোহী, আমরা সন্ত্রাসী? নিজের অধিকারের জন্য লড়াই সংগ্রাম করতে গিয়ে মানুষ যদি দেশদ্রোহী হয়, সন্ত্রাসী হয় তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। আমরা তাই করে যেতে প্রস্তুত রয়েছি।

স্বাধীনতার পর মহান বিপ্লবী নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা গণতান্ত্রিক উপায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের গণমানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও প্রত্যাশিত কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে জুম্ম জনগণকে তাড়ানোর চক্রান্ত পাকিস্তান আমলে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের মধ্য দিয়ে পুরোদমে শুরু হয়েছিল। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর রেখে যাওয়া একই বশংবদ নীতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীও জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব বিলুপ্তিকরণের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে পিছিয়ে পড়া জুম্ম জনগণের দাবির প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাব ও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিনিধিদলের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ এবং জুম্ম জনগণের অবিসংবাদিত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সাথে দুরভিসন্ধিমূলক আচরণই ধীরে ধীরে জুম্ম জনগণের মনে শাসকগোষ্ঠীর প্রতি সন্দেহ ও ক্ষোভের সৃষ্টি করে। স্বাধীনতার চার বছরের মাথায় সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর এমন দূরে ঠেলে দেওয়ার নীতি পাহাড়ের মানুষকে হতবাক করেছে। ৭৫-এর ১৫ আগস্ট স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পর সারা দেশে সামরিক শাসন জারী হয়ে যায় এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়। এহেন পরিস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য গণতান্ত্রিক উপায়ে পদক্ষেপ নেওয়া কখনোই সম্ভব ছিলো না। আত্মরক্ষার্থে বাধ্য হয়ে অগণতান্ত্রিক পন্থায় জুম্ম জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে জুম্ম জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে। জুম্ম জনগণের একমাত্র কান্ডারী সংগঠন জনসংহতি সমিতির পতাকাতলে সামিল হয়ে শতশত জুম্ম তরুণ শাসকগোষ্ঠীর অসম শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ়ভাবে শপথ নেয়। জনবল, অর্থবল ও অস্ত্রবল যদিও আমাদের জুম্ম জনগণের মধ্যে সীমিত ছিল, তারপরও পার্টির সক্রিয় কর্মীদের মধ্যে অগাধ দেশপ্রেম ও জাতিপ্রেম আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিল। মাতৃভূমিপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জুম্ম জাতির মুক্তির ব্যাপারে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে অসংখ্য জুম্ম তরুণ সর্বদাই উদগ্রীব ছিলো। শাসন-শোষণ ও পরাধীনতার প্রতি তীব্র ঘৃণা ছিল বিধায় এমনতর পরিস্থিতিতে অসম শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে যাওয়ার জন্য তাদের মধ্যে ধৈর্য, মনোবল, সাহস, শক্তি ও কৌশল সকল প্রকার শর্ত জাগ্রত ছিল। শাসকগোষ্ঠী যতই শক্তিশালী হোক, এই শক্তিশালী সেনাবাহিনীর সামনে তৎকালীন পাহাড়ের বিপ্লবী জুম্ম তরুণরা বুক ফুলিয়ে লড়াই চালিয়েছিল এবং শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে প্রতিটি যুদ্ধে নাকানিচুবানি খাইয়ে কাবু করতে সক্ষম হয়েছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতির আলোকে দীর্ঘ দুই যুগের অধিক সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে ছিল জনসংহতি সমিতি। যাদের মধ্যে রাজনৈতিক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও নীতি, আদর্শ ছিল। সেই সময়ের অসংখ্য জুম্ম ছাত্র তরুণ মাতৃভূমিপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জুম্ম জাতির প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গের জন্য উৎসুক ছিলেন। বিপ্লবী রাজনৈতিক তত্ত্বে বলা হয়েছে, গাছ যেমন জমিনের রস খেয়ে দেহ বৃদ্ধি করে ঠিক তেমনি পাহাড়ের ৭০-৮০ দশকের সশস্ত্র গেরিলা যোদ্ধারাও জুম্ম জনগণের কাছ থেকে রস খেয়ে লড়াই চালিয়েছিলেন। জুম্ম জনগণের গর্ভেই জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র গেরিলাদের জন্ম হয়েছিল, কাজেই জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব রক্ষার্থে তারা সব সময় সোচ্চার ও সচেতন ছিলেন। জুম্ম জনগণের গর্ভেই জন্মলাভ করা ৬০-৭০ দশকের জুম্ম ছাত্র সমাজের বীর সেনানীরা স্বপ্ন দেখেছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের অধিকার ছিনিয়ে এনে দেবে, তাদের মুখে হাসি ফুটাবে এবং পাহাড়ের গণমানুষের দুঃখ-কষ্ট, গ্লানিভরা যন্ত্রণাকে মুছে দিয়ে পাহাড়ের নিজস্বতা ও স্বতন্ত্রতা ফিরিয়ে আনবে। উপযুক্ত রাজনৈতিক গাইডলাইনকে সামনে রেখে নিপীড়িত জুম্ম জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীকে পরিণত হয়েছিল সেদিনের প্রিয় অগ্রজ বীর সেনানীরা। মাঝিবিহীন নৌকা সঠিক গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে না, কাজেই প্রয়াত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার রাজনৈতিক ও সামরিক উভয়ের সুদক্ষ পরিচালনায় আন্দোলন সঠিক পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। যুগ যুগ ধরে বিপর্যয়ে দীর্ণবিদীর্ণ জুম্ম জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং শতশত বীরযোদ্ধা নিজের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। একজনের মৃত্যুবরণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যজন এসে খালি স্থান পূরণ করেছেন। জীবন উৎসর্গের এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়া পাহাড়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বহন করে চলবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

নিজ ভূমি ও জুম্ম জনগণের মুক্তির যথার্থ সন্ধান ৬০-৭০ দশকের জুম্ম তরুণরাই দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের রাজনীতির প্রতি অসংখ্য ছাত্র ও যুবক এখনো

সত্যিই উদাসীন। নিজের অধিকারের প্রতি উদাসীনতার কারণে আজ পাহাড়ের সমস্যা দিন দিন জটিল হতে জটিলতর হচ্ছে। পাহাড়ের সমস্যাকে তারা এখনো পুরোপুরি বুঝার চেষ্টা করেন না, এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি সম্পর্কে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ অজ্ঞই রেখেছেন। অথচ আন্দোলন পরিচালনার মহান দায়িত্বভার ব্যাপক জুম্ম ছাত্র সমাজের উপরই অর্পিত রয়েছে। সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে ব্যাপক জুম্ম ছাত্রসমাজের মধ্যে এখনো রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এটা আমাদের জুম্ম জাতির জন্য চূড়ান্ত অর্থে বিপদজনক একটা পরিস্থিতি ও অশনিসংকেত বলা যায়। তারপরও ত্যাগের প্রেরণা আসে সত্যিকার অর্থে প্রকৃত ভালবাসার গভীরতা থেকে। গভীরভাবে ভাল না বাসলে রাজনৈতিক কর্মীদের দেশের এবং জনগণের প্রতি সেবা ও ত্যাগের মনোভাব জন্মায় না। শোষিত, বঞ্চিত জাতি ও মানুষের প্রতি যার মধ্যে ভালবাসা নেই, তার সেবা ও ত্যাগের প্রেরণা থাকে না। মাতৃভূমি রক্ষার্থে আত্মোৎসর্গের মনোভাব নিয়ে পৃথিবীতে কেউ জন্মগ্রহণ করে না। সামাজিক ও পারিপার্শ্বিকতার সুশিক্ষার মাধ্যমে এসব গুণাবলী অর্জিত হয়ে থাকে। জুম পাহাড়ের মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট, হাজারো বেদনা, বঞ্চনা ও যন্ত্রণাকে ভালবাসার গভীরতা থেকে জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব রক্ষা করার ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের মনোভাব জন্মাতে পারে বলে আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি!

সবশেষে এরশাদ আমলের সামরিক সরকার পেরিয়ে খালেদা জিয়া সরকার আমল এবং সর্বশেষ শেখ হাসিনা সরকার আমলেই দীর্ঘ ২৬ বার বৈঠকের পর ১৯৯৭ সালে ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘ দুই যুগের অধিক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের অবসান ঘটিয়ে স্থায়ী শান্তির লক্ষ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশ শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামে অপারেশন দাবানল এর পরিবর্তে অপারেশন উত্তরণ নাম দিয়ে চুক্তির আগের ন্যায় আজও এক ধরনের সেনাশাসন জিইয়ে রেখেছে। ফলশ্রুতিতে পাহাড়ের বুকে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে তা আজও বাস্তবায়নের আশানুরূপ সাফল্যের মুখ দেখেনি। চুক্তির আগের মতোই পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনও জুম্ম জনগণের উপর সেনাবাহিনীর নির্দয় সেনাশাসন, সেনা নির্যাতন ও অমানবিক অত্যাচার চালিয়ে চুক্তিকে পুরোপুরিভাবে লঙ্ঘন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখানো হচ্ছে। এমনতর পরিস্থিতি ও বাস্তবতায় জুম্ম জনগণ আজও পার্বত্য চট্টগ্রামে নিজ ভূমিতে পরবাসীর মতন জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

জুম্ম জনগণ নিজের অধিকারের জন্য লড়াই করতে শিখেছে, নিজের অধিকারের জন্য আত্মোৎসর্গ করতে শিখেছে, নিজের অধিকারের জন্য রক্ত ঢেলে দিতে শিখেছে। কাজেই পৃথিবীর বুকে অধিকারকামী জাতিকে দমিয়ে রাখা যেকোনো শাসকের পক্ষে সম্ভব নয়। যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতি নিজের অধিকারের জন্য লড়াই করতে শিখেছে ও জেনে-বুঝে নিয়েছে, সেহেতু এই জাতিকে দমন-পীড়ন চালিয়েও থামিয়ে রাখার হীন প্রয়াস শাসকগোষ্ঠী কোনোদিনই সফল হবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জাতিসমূহকে নিজস্ব অধিকারের সনদ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন পূর্বক অধিকার ফিরিয়ে দিলে তা ন্যায়সঙ্গত কাজ হবে। বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের মুখ আরও উজ্জ্বল হবে, দেশের ভাবমূর্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে আর পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানের পথও উন্মুক্ত হবে।

‘...মানুষকে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার অধিকার দিতে হবে। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। সেটা যদি দিতে না পারেন, তাহলে বলব আপনারা অত্যাচারী সরকার, গণবিরোধী সরকার। আপনারা যদি সরকার হিসেবে আপনাদের দায়িত্ব পালন করতে না পারেন, তাহলে জনসাধারণ আপনাদের ক্ষমা করবে না। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে নাই।’

—মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

(জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে ১৯৭৪ সালের ৫ জুলাই)

এম এন লারমার ঐতিহাসিক দায়িত্ব তরুণ সমাজকেই কাঁধে তুলে নিতে হবে

মোনালিসা চাকমা

১৯৩৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাগ্যাকাশে এক ধ্রুবতারার জন্ম। তৎকালীন ক্ষয়িষ্ণু সামন্তীয় সমাজ ব্যবস্থার বেড়াজালে আবদ্ধ নান্যাচরের মাওরুম গ্রামের মোটামুটি স্বচ্ছল ও শিক্ষিত এক পরিবারে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা।

এই মহান নেতা সম্পর্কে কিছু বলা বা লেখা সত্যি সত্যিই মহাধৃষ্টতার সামিল। তাই তাঁর যাপিত জীবন সম্পর্কে আলোচনা করতে নয়, বরং তৎকালীন সামন্তীয় সমাজব্যবস্থার অন্তরালে থেকেও তিনি কিভাবে তাঁর প্রদর্শিত পথে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে মুক্তির মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত করেছেন সে সম্পর্কে জানা। তবে আমার মত নতুন প্রজন্মের কাছে মানবেন্দ্র লারমার জীবনাদর্শ সত্যি সত্যিই অত্যন্ত বিস্ময়কর ও অভাবনীয়। বলাবাহুল্য, সেই সময়ের সর্বস্তরের জনগণকে সংঘবদ্ধ করে বিপ্লবের মর্মার্থ বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে জুম্ম জাতীয়তাবাদের জনক, পার্বত্য চট্টগ্রামের অসহায় নিপীড়িত জনমানুষের একমাত্র আলোর দিশারি, এক মহান স্বপ্নদ্রষ্টাকে আমরা হারালাম চিরতরে সেই স্বার্থান্বেষী মহলের কালো শক্তির কাছে, যার আগুনে আজও পুড়ছে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের লক্ষ লক্ষ অসহায় জুম্ম জনগোষ্ঠী। তিনি শুধুমাত্র জুম্ম জনগোষ্ঠীর কথা নয়, বরং তৎকালীন সামন্তীয় সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে গেছেন আপোষহীন কণ্ঠে। অথচ সেই ষাটের দশকে অনেক শিক্ষিতদের কাছে যা ছিল অকল্পনীয় এবং এম এন লারমার দূরদর্শিতা ও প্রতিবাদ হয়ত অনেকের কাছেই দৌরাত্ম্য বলে মনে হয়েছিল সেই সময়।

বিশেষ করে ১৯৬০ সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক কাপ্তাই বাঁধের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের যে কোনো ধরনের অভাবনীয় ক্ষয়ক্ষতি ও বিপর্যয়ের মুখে পড়তে যাচ্ছে তা তিনি আগে থেকেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। তিনি জনসচেতনতা ও প্রতিবাদস্বরূপ মরণফাঁদ কাপ্তাই বাঁধের উপর লিফলেট বিতরণ করেন এবং তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান সরকারের রোষের শিকার হয়ে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় দুই বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। তিনি সেই সময় জেলে অন্তরীণ অবস্থায় আইন বিষয়ে পড়াশুনো করেন এবং এলএলবি পাশ করেন।

আজ প্রায় ষাট বছরের অধিক সময় পর আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, তাঁর প্রদর্শিত পথের সঠিকতা ও যুগোপযোগিতা থাকবে ততদিন পর্যন্ত, যতদিন পর্যন্ত জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হয়। এম এন লারমা সেই প্রতিকূল সময়েও কত গভীরভাবেই না জুম্ম জনমানুষের জন্য চিন্তা করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন, তা সত্যিই অভাবনীয়। তিনি জানতেন যে, অধিকার কেউ কাউকে এমনি এমনি দেয় না, অধিকার আদায় করে নিতে হয়। আর তাইতো তিনি জুম্ম জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামে শ্রেণিবিভক্ত সমাজের সর্বস্তরের মানুষজনকে সংঘবদ্ধ করে শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি যে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘুমন্ত জুম্ম জনগণকে জাগিয়ে তুলেছিলেন সেই জাগানিয়া আজো চলমান রয়েছে, ভবিষ্যতেও জুম্ম সমাজের মধ্যে অনন্তকাল ধরে থাকবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমরা যদি এম এন লারমার কর্মজীবনের দিকে তাকাই, তাহলে নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, তাঁর মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা, সরলতা, আত্মবিশ্বাস, যৌক্তিকতা অন্যতম প্রধান গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। তিনি 'ক্ষমা কর ভুলে যাও' নীতিতে বিভেদপন্থীদের ক্ষমা করেছিলেন। কিন্তু নিয়তির কী নির্মম পরিহাস যে, সেই ক্ষমা কর ভুলে যাও নীতির সুযোগেই পরবর্তীতে চার কুচক্রী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ গংদের হাতে খুন হন এই মহান ক্ষণজন্মা বিপ্লবী নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা।

তিনি তাঁর জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি কতটুকু তার সহকর্মীদের বিশ্বাস করতেন। এমনকি, মৃত্যুর ঠিক আগে নাকি তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে মেরে যদি তোমরা এই অধিকারবঞ্চিত জুম্ম মানুষের অধিকার এনে দিতে পার, তবে আমাকে মেরে ফেল'। তিনি যে মৃত্যুর সন্নিকটে দাঁড়িয়েও জুম্ম জাতির জন্য চিন্তা করে গেছেন তা বলাই বাহুল্য।

তিনি নারী অধিকারের পক্ষে ছিলেন সোচ্চার। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাথে নারী মুক্তি আন্দোলনকে সম্পৃক্ত করার গুরুত্ব গভীরভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। আর তাইতো তিনি বলেছেন, নারীরও পুরুষের ন্যায় অধিকার ভোগ করা উচিৎ, তবেই নারীমুক্তি সম্ভব। এতেই অনুধাবন করা যায় যে, তিনি সত্যিকার অর্থেই জ্ঞানী ও দূরদর্শীতাসম্পন্ন একজন নেতা ছিলেন।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৯৭২ সালে জনসংহতি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ সরকারের

তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর সামরিক বাহিনী ক্ষমতা কুক্ষিগত করলে সকল গণতান্ত্রিক পথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং এম এন লারমা সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হন।

পার্বত্য চুক্তি পরবর্তী সময়ে মহান নেতা এম এন লারমার যাপিত জীবন ও সংগ্রামের উপর মাত্র একটি স্মারকগ্রন্থ আমরা পেয়েছি। তাছাড়া তাঁর সম্পর্কে স্মৃতিচারণমূলক কিছু লেখা থেকে আমরা যারা নতুন প্রজন্ম তার থেকেই অতি সামান্যই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্বভাব, বিচক্ষণতা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা পাই। তথাপি এই অতিকিঞ্চিৎ ধারণাকে অবলম্বন করে নতুন প্রজন্মকে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার দূরদর্শিতা ও ত্যাগ-তিতিক্ষা, সর্বোপরি তাঁর জীবনাদর্শকে পাথেয় করে পথচলা আমাদের নতুন প্রজন্মের একান্ত কর্তব্য হওয়া উচিত।

বিশেষত আশির দশক থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের পার্বত্যাঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে সমূলে নির্মূল করার যে পাঁয়তারা সেনাবাহিনী ও সরকার করছে তার বিপরীতে জুম্ম জনগণের অধিকার ও অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার স্বার্থেই এম এন লারমার জীবনাদর্শ ও প্রদর্শিত পথে চলা অপরিহার্য তা সময়ের দাবি বলে আমি মনে করি। অন্যথায় আমাদের মত সংখ্যায় কম জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব বিলীন হতে খুব বেশি সময় লাগার কথা নয়। বিশেষত এই পুঁজিবাদী সমাজ বাস্তবতার যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে যা আরও দ্রুতগামী হচ্ছে। তাই নবপ্রজন্মের উচিৎ এম এন লারমার জীবনাদর্শকে ধারণ ও লালন করে ইতিহাসের ভাগ্যবিড়ম্বিত, নিপীড়িত, শোষিত জুম্ম জাতির তিমির কালো রাত্রির অবসান করা। সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব প্রগতিশীল দেশপ্রেমিক তরুণ সমাজকেই তুলে নিতে হবে।

> ‘আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বাস করে আসছে। বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় বাঙালিদের সঙ্গে লেখাপড়া শিখে আসছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সব দিক দিয়েই আমরা একসঙ্গে একযোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দ পুরুষ—কেউ বলে নাই, আমি বাঙালি।’
>
> *৩১ অক্টোবর ১৯৭২ ‘বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন’ সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাবেব উপর গণপরিষদে প্রদত্ত এম এন লারমার ভাষণের অংশবিশেষ*

বিপ্লব-পিপাসু এক মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৯৫৫ সালে রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার সময় মাত্র ১৭ বছর বয়সে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির সঙ্গে জড়িত হন। স্কুলের গন্ডী পেরিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পড়ার সময় তিনি ছাত্র ইউনিয়নে যোগদান করেন। মূলতঃ এই সময় থেকেই তিনি সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন।

১৯৫৭ থেকে ১৯৬২ এই সময়ে রাঙ্গামাটিতে তৈরি হয় জুম্ম জনগণের মরণ ফাঁদ কাপ্তাই বাঁধ। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জুম্ম জনগণের জীবনে নেমে আনে সর্বনাশের কালো থাবা। ১৯৬২ সালে কাপ্তাই বাঁধের সকল নির্গমন দরজা বন্ধ করে দিলে ডুবে যায় রাঙ্গামাটি শহর, পাহাড়, কৃষি জমি, গ্রাম জনপদ, এমনকি তৎকালীন চাকমা রাজবাড়িও। বাঁধের ফলে ৭৭৭ বর্গ কি:মি: জনপদ প্লাবিত হয়। প্রথম শ্রেণির ৫৪ হাজার একর ধান্য জমি পানির নিচে তলিয়ে যায়। উদ্বাস্তু হয়ে নিরুদ্দেশ হতে হয় অসহায় জুম্ম জনগণকে। উদ্বাস্তুদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা দেওয়া হয়নি। কিন্তু জুম্মদের মধ্যে সে সময়কার যারা নেতৃত্বে ছিলেন তারা কেউ এই ঘটনায় প্রতিবাদ জানাননি। বরং উল্টো সরকারের এমন ভূমিকায় প্রশংসা করেছেন। এমন অবস্থায় সে সময়ে চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় মাত্র ২৪ বছর বয়সে কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে প্রচারপত্র বিলি করেছিলেন তিনি। কাপ্তাই বাঁধের বিরোধিতা ও প্রতিবাদ করার জন্য ১৯৬৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে। শুধু গ্রেফতার করেই ক্ষান্ত হয়নি সরকার, তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। প্রায় তিন বছর কারাভোগের পর ১৯৬৫ সালে ৮ মার্চ চট্টগ্রাম কারাগার থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

১৯৬৬ সালে শিক্ষকতা দিয়ে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়ে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন অধিকার আদায় করতে হলে প্রয়োজন শিক্ষিত জনবল। তিনি এও ভেবেছেন জাতিকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে না পারলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই ও সংগ্রাম কোনটাই সম্ভব নয়। এই জন্য তিনি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য জনসচেতনতা গড়ে তোলেন। শিক্ষা প্রসঙ্গে তিনি বলতেন, সকল জুম্ম জনগণকে শিক্ষিত হতে হবে। অন্য জাতির লোক কখনো অজপাড়া গাঁয়ের লোকদের পড়াশুনা শেখানোর দায়িত্ব নেবে না। কাজেই নিজেদেরকে এ দায়িত্ব কাঁধে নিতে হবে। জুম্ম জনগণ শিক্ষিত হলে প্রগতিশীল ভাবধারার লোকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আন্দোলনে সামিল হতে পারবে। সে জন্য অশিক্ষিত সমাজকে শিক্ষিত করে তোলার ওপর জোর দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষিত সচেতন সংগঠিত জনগণকে নিয়েই সহজে বিপ্লব করা সম্ভব।

তিনি মনে করতেন জুম্ম জনগণ শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে থাকার কারণে অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রেও পিছিয়ে আছে। তাই যারা পড়াশুনা করবে তারা যেন পড়াশুনা শেষ করে শিক্ষকতা পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। এজন্য তিনি সকলকে উদ্বুদ্ধ করতেন। উদ্দেশ্য হলো শিক্ষকতা করে সমাজকে শিক্ষিত করা, সচেতন করা। তিনি মনে করতেন একমাত্র শিক্ষকতা পেশার মাধ্যমে জাতিকে সত্যিকারের কিছু দেওয়া সম্ভব। সে জন্য তিনি নিজেই শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নেওয়ার পক্ষে তাঁর জোরালো যুক্তি ছিল বলে তিনি যেমন শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নিয়েছিলেন, তেমনি তাঁর ছোট ভাই জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)-কেও শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নিতে উৎসাহিত করেছিলেন। সেই সময় তাঁর সহযোগী অনেকেই শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে তিনি অন্যদেরকে যেভাবে সম্পৃক্ত করেছেন তেমনি নিজের ছোট ভাইকেও আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। ছোট ভাইকে রাজনৈতিকভাবে যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি প্রতিনিয়ত ভূমিকা পালন করেছেন। গোটা সমাজে এ এক বিরল দৃষ্টান্ত।

১৯৬৮ সালে চট্টগ্রামের রেলওয়ে কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষক থাকা অবস্থায় তিনি বিএড এবং ১৯৬৯ এলএলবি পাশ করেন। এলএলবি পাশ করে আইনজীবী হিসেবে চট্টগ্রাম বার এসোসিয়েশনে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম আইনজীবী। এ সময় থেকেই মূলতঃ তিনি পুরো মাত্রায় রাজনৈতিক ও সংগ্রামী জীবনে প্রবেশ করেন। সে বছরই বার এসোসিয়েশনে আইনজীবী হিসেবে যোগদান করেন।

তিনি ১৯৭০ সালের পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়। সংবিধান রচনাকালে গণ-পরিষদের সদস্য হিসেবে এম এন লারমা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি একজন আদিবাসী হিসেবে সংবিধানে আদিবাসীদের অধিকার সন্নিবেশ করার আপ্রাণ চেষ্টা

করেছিলেন। তিনি এতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তবে সংসদে প্রদত্ত সংবিধান সংক্রান্ত তাঁর বক্তব্য এখনো বাংলাদেশের মানুষের জন্য প্রাসঙ্গিক।

বাংলাদেশ নামক একটি ভূ-খন্ডের স্বাধীনতা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের আদিবাসী জনগণ বর্তমানেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পায়নি। এধরনের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বাস্তবতার বাংলাদেশে আদিবাসী কিংবা সংখ্যালঘু জনগণের স্বাধীনতা বা আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ে একেবারেই ভাবাই যায় না। যার কারণে বাংলাদেশের আদিবাসীরা 'আদিবাসী' কিংবা চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাঁওতাল ইত্যাদি নামে স্বীকৃত নয়। যেহেতু সংবিধানে 'বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালি' সেহেতু সংবিধানের ভাষায় তারা জাতিগতভাবে বাঙালি। সে দিক থেকে বিচার করলে বাংলাদেশের সংবিধান অসাম্প্রদায়িক কিংবা গণতান্ত্রিক হয়ে উঠতে পারেনি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সংবিধান প্রণয়ন করার প্রাক্কালে এম এন লারমা উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য পৃথক শাসনব্যবস্থাসহ জুম্ম জনগণের সাংবিধানিক রক্ষাকবচ দাবি করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রীয় শক্তি এম এন লারমার ন্যায্য দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে। সংবিধানে সকল ধর্ম ও অবহেলিত পশ্চাৎপদ (অবাঙালি) জাতিগোষ্ঠীর সমমর্যাদা রক্ষার জন্য এম এন লারমা বারংবার আইন প্রণেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

এম এন লারমার স্বপ্ন ছিল সংবিধানে জাতি-শ্রেণি নির্বিশেষে সকলের অধিকার সংরক্ষিত হবে এবং ঔপনিবেশিক অপশাসনের সকল কালাকানুন ও দমন-পীড়নের চির অবসান হবে। তাইতো তিনি সংবিধানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ গোত্র-লিঙ্গ নির্বিশেষে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের দাবি তুলেছিলেন।

লক্ষণীয় বিষয় যে, সে সময়ে গণপরিষদে উত্থাপিত এম এন লারমার বক্তব্যের প্রতি অপরাপর সম্মানিত গণপরিষদ সদস্যগণ তেমন কোন গুরুত্ব প্রদান করেননি। গণপরিষদের অনেক সদস্য তাঁকে বক্তব্য দানে বাধা প্রদান করেছিলেন। অথচ এম এন লারমার প্রতিটি কথা আজ ফলছে। তিনি বলেছিলেন, ৩০ লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে এ সংসদ। এ স্বাধীন বাংলাদেশ সাড়ে সাত কোটি মানুষের দেশ এই বাংলাদেশ। তাই সংবিধানে সাড়ে সাত কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হবে। নইলে ৩০ লক্ষ মানুষের রক্তের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। তিনি বলেছিলেন, এই সংবিধানে মানুষের অধিকার যদি খর্ব হয়ে থাকে, তাহলে আজকে ৩০ লক্ষ শহীদদের কথা স্মরণ করে, অতীতের ইতিহাসের স্মরণ করে বলেন যে, 'ইতিহাস কাউকে কোনো দিন ক্ষমা করেনি, করবেও না। ইতিহাস বড় নিষ্ঠুর।'

এম এন লারমা ১৯৭২ সালে এই ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন। আর কয়েক বছর যেতে না যেতেই তাঁর ভবিষ্যতবাণী বাস্তবে প্রতিফলিত হল। গণতন্ত্রকে কবর দিয়ে বাকশাল প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হলো। এক সামরিক অভ্যুত্থানে ১৯৭৫ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হল। সামরিক শাসন জারি করা হল। গণতন্ত্রের কবর রচনা করা হল। ১৯৭২ সালের সংবিধানকে সংশোধন করা হল। সংবিধানের চার মূলনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র বাদ দেওয়া হল। বহুবার সংবিধান কাটাছেঁড়া করা হলো। এক পর্যায়ে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম করা হল। সবচেয়ে বেদনাদায়ক বিষয় হল- বর্তমান সরকারের আমলে ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম রয়ে গেল। আদিবাসীরা আদিবাসী হিসেবে বা তাদের স্ব স্ব জাতির নামে স্বীকৃতি পেল না। এসব সংখ্যালঘু অবাঙালি জাতিসমূহের উপর জাতি হিসেবে বাঙালি পরিচয় চাপিয়ে দেওয়া হল।

এম এন লারমা ১৯৭২ সালে ২৫ অক্টোবর তারিখে সংবিধান বিলের উপর আলোচনা করতে যেয়ে সংবিধানের মেহনতি মানুষের অবস্থান সম্পর্কে বলেছিলেন, রোদ বৃষ্টি মাথায় করে যাঁরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরে নিজেদের জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করে নৌকা বেয়ে, দাঁড় টেনে চলেছেন। রোদ বৃষ্টি মাথায় করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাঁরা শক্ত মাটি চষে সোনার ফসল ফলিয়ে চলেছেন, তাদের মনের কথা এই সংবিধানে নাই।

১৯৭২ সালে সংবিধানের কৃষক, শ্রমিক, জেলে, তাঁতীসহ দেশের সকল মেহনতি মানুষের মহান নেতা এম এন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ে নানাভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। একদিকে তিনি আন্ডারগ্রাউন্ড জীবন যাপন করেছেন। সকালের অজ্ঞাতে থেকেই আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। কিন্তু তিনি অনুভব করেছেন এর মধ্যে দিয়ে আন্দোলনে তেমন কোনো ঢেউ সৃষ্টি হচ্ছে না। অথচ আন্দোলনের প্রচন্ড ঢেউ তিনি অনুভব করলেন আঞ্চলিক সীমার বাইরে। সারাদেশ ও দেশের বাইরের জনগণকে সম্পৃক্ত করা না গেলে সফল হওয়া কঠিন। তাই তিনি নির্দেশনা দিয়েছিলেন, নীতিগতভাবে আত্মনির্ভরশীলতার নীতি গ্রহণ করা এবং কৌশলগতভাবে দেশে-বিদেশে বন্ধু তৈরি করা এবং তাদের সমর্থন আদায় করা।

এম এন লারমার মত আত্মত্যাগী ও নিঃস্বার্থ মহান বিপ্লবী নেতা এই দেশের একজনকেও দেখা যায়নি। আমাদের চারদিকে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা বড় বড় বুলি আওড়ান, রাতারাতি সব কিছু বদলে দিতে চান। কিন্তু বাস্তবতাকে

মোটেই বিবেচনায় নিতে চান না। দিকভ্রান্ত অতিবিপ্লবী তৎপরতার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের পথে ধাবিত না হয়ে বিপথে ভুল কৌশলে কেবল নিজেদের অপচয় করেন। আর সমাজ বিপ্লবের মহান স্বপ্নকে করে তোলেন হাস্যকর অলিক বিষয়ে।

১৯৭২ সালে সংবিধানে আদিবাসীদের অধিকার সন্নিবেশিত না হওয়ায় এম এন লারমা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অধিকার আদায়ের কথা ভাবতে থাকেন। তিনি একই বছরে অর্থাৎ ১৯৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য জুম্ম জনগণের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠন করেন। ১৯৭৫ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের নারী সমাজকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সংগঠিত করার লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি গঠন করা হয়।

১৯৭৫ সালে দেশের রাজনৈতিক পথ পরিবর্তন হবার কারণে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন বন্ধ হলে এম এন লারমা সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করেন। এম এন লারমা সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্রেও একজন বিপ্লবীর পরিচয় দেন। তাঁর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি শক্তিশালী সশস্ত্র সংগঠন গড়ে উঠে। এম এন লারমার নেতৃত্বে গড়ে উঠা আন্দোলন ও সংগঠনকে ধ্বংস করার জন্য দেশি-বিদেশী চক্র ষড়যন্ত্রের জালে জুম্ম জাতির মীর জাফর গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ আটকে পড়ে। এই চার কুচক্রী ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে যায়। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে তারা জুম্ম জনগণের প্রাণ প্রিয় নেতা বিপ্লবী এম এন লারমাকে ১০ নভেম্বর ১৯৮৩ রাতের আঁধারে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

এম এন লারমা শহীদ হলে তাঁর ছোট ভাই জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সন্তু লারমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। এম এন লারমার নির্দেশিত পথেই তিনি সশস্ত্র আন্দোলনের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। আরো কিছু গণতান্ত্রিক সংগঠন গড়ে তোলার চিন্তা-ভাবনা করেন। যারা বাইরে থেকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে জুম্ম জনগণের দাবিগুলো জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সময়ে পাহাড়ি গণ পরিষদ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন গড়ে উঠে।

জনসংহতি সমিতি বরাবরই একদিকে সংগ্রাম, অপরদিকে সংলাপের পথ সর্বদা খোলা রেখেছিল। সে কারণে জনসংহতি সমিতির সাথে এরশাদ সরকার, খালেদা জিয়ার সরকার ও শেখ হাসিনা সরকারের সাথে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ শেখ হাসিনা সরকারের সাথে ৭ বার বৈঠকের পর সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যেকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তবে দুঃখজনক যে, শেখ হাসিনা সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ অদ্যাবধি বাস্তবায়ন করেনি। চুক্তি বাস্তবায়ন না হবার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতিসমূহের অস্তিত্ব এখনো অনিশ্চিত। চুক্তির অঙ্গীকার অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে থাকবে কি থাকবে না এখনো অনিশ্চিত। জুম্ম জনগণ স্বভূমিতে নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি, অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে কি পারবে না এখনো অনিশ্চিত। জুম্ম জাতিসমূহের অস্তিত্ব ও তাদের ভাষা, সংস্কৃতি সুরক্ষার নিমিত্তে পার্বত্য চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন জরুরি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি দরকার নিজেদের মধ্যে ইস্পাত কঠিন ঐক্য। প্রয়োজন নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন জুম্ম জনগণের সমর্থন আদায়ের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ। আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে নতুনভাবে সবকিছু মূল্যায়ন করে দেখতে হবে। প্রতিবিপ্লবী ও অতিবিপ্লবীপনা বিসর্জন দিতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান বাস্তবতায় পার্বত্য চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন জোরদার করাই আমাদের একমাত্র করণীয়।

এম এন লারমাকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এম এন লারমা জুম্ম জনগণের প্রতিটি মানুষের মাঝে বেঁচে আছেন। এম এন লারমা বলেছেন, যে জাতি সংগ্রাম করতে জানে না, সে জাতির বাঁচার অধিকার নাই। জুম্ম জাতি সংগ্রাম করতে শিখেছে। এ জাতি সংগ্রাম করে অধিকার ছিনিয়ে আনবে- এটিই অনিবার্য। তাই মহান বিপ্লবী নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংগ্রামী চেতনা এবং আত্মত্যাগের মহান আদর্শে বলীয়ান হয়ে জুম্ম ছাত্র-যুব, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে ঐতিহাসিক দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে ইস্পাত কঠিন ঐক্য ও সংগ্রামী চেতনা নিয়ে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন তথা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে সামিল হতে এগিয়ে আসতে হবে।

মহান বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাঁর নীতি আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠা পাটি তাঁরই প্রদর্শিত পথ হতে শত প্রতিকুলতা সত্ত্বেও আজও বিচ্যুত হয়নি। জুম্ম জাতি যতদিন স্বীয় অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকবে ততদিন মহান বিপ্লবী এম এন লারমা চিরজীবী হয়ে থাকবেন।

১০ নভেম্বর : জুম্ম ছাত্র-যুবদের এম এন লারমার চেতনায় জাগরণের দিন

বাচ্চু চাকমা

১০ নভেম্বর আমাদের জুম্ম জাতীয় জীবনে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়, হৃদয় বিদারক ও বিভীষিকাময় একটি দিন। পুরো জুম্ম জাতির হৃদপিণ্ডে হঠাৎ বিষাদের কালো ছায়া নেমে এসেছিলো সেদিন। জুম্ম জাতির এই বিষাদময় মুহূর্ত দেখে সারা দুনিয়ার শোষিত, বঞ্চিত মানুষ ব্যথিত ও হতচকিত না হয়ে নিশ্চয়ই স্বাভাবিকভাবে থাকতে পারেনি। এদিনে আমরা হারিয়েছি ৮ জন সহযোদ্ধা আমাদের অতি আপনজন ও আমাদের অতি প্রিয়জন, হারিয়েছি জুম্ম জাতির মহান অগ্রদূত প্রাণপ্রিয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে। অসংখ্য জুম্ম ছাত্র-যুবকরাই এই কলঙ্ক ও জঘন্য ষড়যন্ত্র দেখে সেদিন হতবাক না হয়ে থাকতে পারেনি। জুম্ম জাতির জাতীয় জাগরণের মহান অগ্রদূত, জুম্ম জনগণের একমাত্র কান্ডারী রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, চিন্তাবিদ, নিপীড়িত মানুষের একনিষ্ঠ বন্ধু, মহান দেশপ্রেমিক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ তাঁর সাথে শহীদ হওয়া ৮ জন বীর সহযোদ্ধাকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সাথে স্মরণ করতে চাই। জুম্ম জাতির এই জঘন্য ষড়যন্ত্র ও কলঙ্কজনক অধ্যায় থেকে জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজকে শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হতে হবে। হাজারো ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়ার পরেও জাতীয় অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে জুম্ম জনগণ করে যাচ্ছে প্রতিবাদ। করে যাচ্ছে শাসকগোষ্ঠীর পাশবিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আর ষড়যন্ত্র ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছে প্রতিরোধ সংগ্রাম। এতো কিছু হারানোর পরেও পাহাড়ের জুম্ম ছাত্র-যুবকরা জুম্ম জাতির মুক্তির আন্দোলন থেকে এখনও সরে যায়নি। ১০ নভেম্বর এর সেই কলঙ্কের দাগ মুছে ফেলতে পাহাড়ের বুকে অসংখ্য জুম্ম ছাত্র-যুবক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর আপডেট খবর রেখে জুম্ম জাতির মুক্তির লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছে। পৃথিবীর দেশে দেশে সীমান্ত নিয়ে নানান সমস্যা, প্রতিবেশী দেশগুলোর পরস্পরের মধ্যে প্রভুত্ব ও দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হওয়ার প্রয়াসে আজ বৈরি এবং অবৈরি উভয়ই দ্বন্দ্ব লেগেই রয়েছে।

পৃথিবীতে বড় বড় জাতিগুলি নিয়ে তো জাতিরাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর দেশে দেশে আরও অসংখ্য ছোট ছোট জাতি রয়েছে, তাদের অবস্থা কি হবে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়ে বহু জাতিরাষ্ট্র ও বহু সংস্কৃতি-এর ধারণাটি চলে এসেছে। প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যে, ছোট ছোট জাতিগুলো বড় বড় জাতির সাথে মিশে যাবে, নাকি তাদের নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করা হবে? এজন্যই বহু জাতিরাষ্ট্র ও বহু সংস্কৃতি-এর ব্যবস্থা প্রতিটি দেশে থাকতে হবে বলে এক সময় জাতিসংঘে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পৃথিবীর দেশে দেশে ছোট ছোট জাতিসমূহের স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দিতে হবে। স্বায়ত্তশাসন মূলতঃ সেখান থেকেই চলে এসেছে। বড় বড় প্রাসাদ বা বড় বড় বাড়িতে ছোট ছোট কক্ষ যেমনি থাকে তেমনি প্রত্যেক দেশের মধ্যে বড় বড় জাতির সাথে ছোট ছোট জাতির অস্তিত্ব রয়েছে। তাদের জন্যই মূলতঃ দেশের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। যাতে করে একটা দেশের মধ্যে বহু ভাষাভাষী, বহু জাতি, বহু সংস্কৃতি ও বহু ঐতিহ্যের বৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করা যায় এবং সে-সবের বিকাশ সাধন করা যায়।

এই ছোট ছোট জাতিগুলোকে নিজেকে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করার প্রশাসনিক অধিকার দিয়ে একটা দেশের মধ্যে তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে। এই অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক মনোভাব ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পৃথিবীতে বহু জাতিরাষ্ট্র ও বহু সংস্কৃতির উদার ও মানবিক রাষ্ট্র গঠন করা হয়েছে। আমরা যদি প্রতিবেশী দেশ ভারতের দিকে একটু নজর দিই তাহলে অবশ্যই দেখবো যে, ভারতের মধ্যে প্রায় ৩২টি রাজ্যের অস্তিত্ব রয়েছে। সেই রাজ্যগুলোর সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে ভারত নামের বহু জাতিরাষ্ট্র ও বহু সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি। ভারতের সেই রাজ্যগুলোর মধ্যে আমাদের মতোই অনেকগুলো ছোট ছোট জাতির অস্তিত্ব দেখা যায়। এই ছোট ছোট জাতিগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে অনেকগুলো রাজ্যকে ভারত সরকার ইতিমধ্যেই সাংবিধানিকভাবে স্বায়ত্তশাসন দিয়েছে। সেই সকল জাতিগুলোর নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যতাকে সংরক্ষণ ও বিকাশের দায়িত্ব নিয়েছে ভারত সরকার। যার কারণে ভারত সরকার পৃথিবীর ইতিহাসে কিছুটা হলেও অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বলা যায়।

আত্মনিয়ন্ত্রণ ও অধিকার এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার গঠিত। পৃথিবীতে ছোট ছোট জাতি এমন অধিকার চায় যেখানে নিজেদের সার্বিক বিষয় নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার নিজেদের হাতে থাকবে। নিজেকে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারই হলো আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার। পার্বত্য চট্টগ্রাম

চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থা'টাও এক প্রকার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সম্বলিত শাসনকাঠামোতে উন্নয়ন, আইন-শৃঙ্খলা, আইন প্রণয়ন, স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষা, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আজ বিশ্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বার্থগত ও মতাদর্শগত বিরোধ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগে রয়েছে। বিশ্বের মধ্যে আমাদের দেশের মতোই ছোট ছোট দেশের অভ্যন্তরে স্বার্থগত ও আদর্শগত বিরোধ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগে থাকাটাই অতি সাধারণ বিষয়। এহেন পরিস্থিতিতে পৃথিবীর দেশে দেশে নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামরত ছোট ছোট জাতিগুলোর মধ্যে শাসকগোষ্ঠী 'ভাগ কর, শাসন কর' এই নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভাজন, বিভক্তি ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত বাঁধিয়ে দিয়ে নিজেরাই বীরদর্পে মাতব্বরি করে চলেছে। কাজেই, পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ও বাস্তবতাকে এভাবেই বিচার-বিশ্লেষণ করা উচিত হবে এবং স্রোতের বিপরীতে প্রগতিশীলতার দম নিয়ে এগিয়ে চলা সমাজের সবচেয়ে অগ্রগামী অংশকে তারই আলোকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জোগাতে হবে। ১০ নভেম্বর যদিও আমাদের জুম্ম জাতীয় জীবনে একটি শোকাবহ দিন, কিন্তু এই শোককে প্রয়াত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার চেতনার শক্তিতে পরিণত করতে সব থেকে আমাদের নজর রাখতে হবে।

পৃথিবীর ইতিহাসে বস্তুগতভাবে বিকাশের পথে অবলুপ্তি আর অবলুপ্তির পথে বিকাশের পথ ধরেই নতুন কিছু সৃষ্টি হবে তা অনিবার্য সত্য। বিগত কয়েক বছরে পাহাড়ের বুকে অর্থনীতি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও বিকাশ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুর অবলুপ্তিও ঘটেছে। পুরানো ধ্যান-ধারণা অর্থাৎ রক্ষণশীলতাকে আঁকড়ে ধরে না থেকে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ সাধন করতে আগ্রহী হতে হবে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমাজ বিকাশের ধারায় যুগোপযোগী ও আরও অধিকতর ধাঁরালো করে অগ্রসর হতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা ও অর্থনীতির বিকাশ হয়েছে, কিন্তু এর পাশাপাশি নানা সমস্যা ও অসুবিধার উদ্ভব হয়েছে তাও সত্য। শাসকগোষ্ঠীর হাত ধরে এই সমস্যা ও বাধা-বিপত্তিগুলো সৃষ্টি হয়েছে বলাবাহুল্য। এই সমস্যা ও অসুবিধা জুম্ম ছাত্র-যুবকদেরকে অটুট মনোবল নিয়ে ধৈর্য ও সাহসের সাথে অতিক্রম করতে হবে। সমগ্র জুম্ম জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা হলো, পাহাড়ের জুম্ম ছাত্র-যুবকরা অধিকতর প্রগতিশীল রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আগামী দিনগুলো আমাদেরই করবে। আমাদের জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনকে আরও বেশি জোরদার করবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জাতিসমূহের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব এবং জুম্ম জনগণের আত্মপরিচয়ের অধিকারকে শাসকগোষ্ঠী প্রত্যাখ্যান করায় তিনি সমগ্র জুম্ম জনগণকে সাথে নিয়ে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলেন। যুগ যুগ ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে পশ্চাৎপদ, ঘুণেধরা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামন্তীয় সমাজের বেড়াজালে আবদ্ধ থেকে জুম্ম জনগণের মধ্যে জুম্ম জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেমের চেতনার উন্মেষ না হওয়ায় জাগ্রত হয়নি জাতিপ্রেম ও জন্মভূমির প্রতি মায়া-মমতা ও ভালবাসা। এই ঘুণেধরা সমাজব্যবস্থার অসংখ্য বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে পাহাড়ের ব্যাপক জুম্ম জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতিপ্রেমের চেতনা জাগিয়ে দিতে সক্ষম হন তিনি। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনুন্নত ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জাতিসমূহকে একটা ছাতার নিচে একত্রিত করে জুম্ম জাতীয়তাবাদ-এর চেতনার জাগরণ ঘটিয়েছিলেন। তিনি একদিকে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী আর অপরদিকে আন্তর্জাতিকতাবাদীও। একদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের পিছিয়ে পড়া জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ে সর্বদাই সোচ্চার ছিলেন, অপরদিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শ্রমিক, কৃষক, মাঝিমাল্লা ও গরীব মেহনতি মানুষের মুক্তির ব্যাপারেও সব সময় সচেতন ছিলেন।

শাসকগোষ্ঠীর নির্মম দমন-পীড়নের স্টিমরোলার থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতিকে মুক্ত করার জন্য জুম্ম সমাজের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে সচেতন, প্রগতিশীল শিক্ষায় শিক্ষিত অগ্রগামী ও একদল সংঘবদ্ধ জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজকে সাথে নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাসে একটা মনে রাখার মতো অভাবনীয় অধ্যায় সৃষ্টি করে জাতীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি প্রথম দিকে গণতান্ত্রিক পন্থায় জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। সারা দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ স্তব্ধ হয়ে গেলেও তিনি আন্দোলনের গতিধারাকে স্তিমিত হতে দেননি। এরপর তিনি অগণতান্ত্রিক পন্থায় জুম্ম জনগণের আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে জুম্ম ছাত্র-যুবকদের অনুপ্রাণিত করেন।

দেশের শাসকগোষ্ঠী যখন যে ভাষায় কথা বলেছিল, জুম্ম জনগণের একমাত্র কান্ডারী রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতিও ঠিক সে ভাষায় জবাব দিতে সদা-সর্বদাই প্রস্তুত ছিল। জুম্ম জনগণের মানবাধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই সংগ্রাম এক মুর্হুতের জন্য থেমে থাকেনি। বিশেষ করে ৮০ দশকে জুম্ম জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রাম যখন তুঙ্গে সেই সময় দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের খপ্পরে পড়ে পার্টির অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা বেঈমান, বিশ্বাসঘাতক, ক্ষমতালোভী, প্রতিক্রিয়াশীল ও বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র নীতিগতভাবে

দ্রুত নিষ্পত্তির তত্ত্ব হাজির করে যা সমগ্র জুম্ম জাতির মুক্তির আন্দোলনের ঐতিহাসিক বাস্তবতার সাথে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। পাহাড়ের জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামকে গলাটিপে হত্যা করতেই মূলতঃ বিভেদপন্থীরা এই দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াইয়ের তত্ত্ব হাজির করেন। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সুদক্ষ নেতৃত্বে রণনীতিগতভাবে দীর্ঘস্থায়ী লড়াই সংগ্রাম এবং কৌশলগতভাবে দ্রুত নিষ্পত্তির সংগ্রামে বিশ্বাসী হয়ে আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত থাকে।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, অমুসলমান অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলমান অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করার হীন চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে বাংলাদেশ শাসকগোষ্ঠী। জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতার অভাবের সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশ শাসকগোষ্ঠী ইসলামি সম্প্রসারণবাদী নীতি ছলেবলে কৌশলে বাস্তবায়ন করতে চায়। বিপরীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণ নিজের আত্ম-মর্যাদা, নিজের স্বতন্ত্রতা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে মানুষের মত মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে আগ্রহী। দেশের অন্যান্য সমতল অঞ্চলের মতোই নিজ নিজ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা বজায় রেখে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে যেতে জুম্ম জনগণ বদ্ধপরিকর। সেকারণে শাসকগোষ্ঠীর হীন চক্রান্তকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে জুম্ম জনগণের ব্যাপক দেশপ্রেমিক ও প্রগতিশীল অংশই প্রতিরোধ সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন। কিন্তু অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর ফাঁদে পড়ে গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র আন্তর্জাতিক মানের একজন স্বপ্নদ্রষ্টা, জুম্ম জাতির জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত ও রাষ্ট্রনায়কের ন্যায় একজন নেতাকে চিনতে পারেনি এবং এক পর্যায়ে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ১০ নভেম্বর এদিনে গভীর অন্ধকারে কাপুরুষোচিত অতর্কিত আক্রমণের মধ্য দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেন। এই চার কুচক্রীর দল মহান নেতাকে হত্যা করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের মূলধারার আন্দোলনকে চিরতরে বানচাল করতে চেয়েছিলেন। প্রয়াত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা যে আশা ও স্বপ্ন নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছেন এবং আন্দোলনের সঠিক রাজনৈতিক নীতি ও কৌশল দেখিয়ে দিয়েছেন তা এখনও পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান রয়েছে। বিপরীতে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর অচিরেই হীন মুখোশ উন্মোচিত হয় এবং সময়ের দাবিতে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

১০ নভেম্বরের এদিনে আপনজন হারানোর কান্না, প্রিয়নেতাকে হারানোর বেদনা ব্যাপক জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজ কিভাবে উপলব্ধি করে আমি জানি না। যে নেতা জুম্ম জাতির মুক্তি কামনায় বছরের পর বছর কঠোর সংগ্রামে নিয়োজিত ছিলেন, যার কণ্ঠ ছিল দুনিয়ার সমস্ত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার, সেই অগ্রনায়ক, জুম্ম জাতির কর্ণধার, জুম্ম জাতীয় চেতনার অগ্রদূত তাঁর সমস্ত জীবন ও সংগ্রামের সাধনাকে বিসর্জন দিয়ে নিজের দায়িত্ব আগামী প্রজন্মের কাছে অর্পণ করে গেছেন। কিন্তু জুম্ম জাতিকে তাঁর আরো অনেক কিছু দেবার মত ছিল, জুম্ম জাতির ভাগ্যাকাশে নির্মম পরিহাস, তাঁর দায়িত্ব অসমাপ্ত রেখে চলে যেতে হয়েছে। আমরা জানি শত প্রলোভন প্রয়াত নেতাকে কোনোদিনই মোহিত করতে পারেনি। একটা আগ্রাসী ও উগ্র জাত্যভিমানী শাসকগোষ্ঠীর যাবতীয় হুমকি তাকে কখনো বিচলিত করতে পারেনি। জুম্ম জাতির বিপদের মুহূর্তে তাঁর মানসিক দৃঢ়তা ও মনোবলে কোনোদিন ভাটা পড়েনি। প্রয়াত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্বার্থত্যাগ ব্যাপক জুম্ম ছাত্র-যুবকদের অনুপ্রাণিত করে। তাঁর এই বিপ্লবী চেতনায় সমগ্র জুম্ম জাতি আজও বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে সাহসী হয়ে উঠেছে। জুম্ম তারুণ্যের শক্তিতে লারমার চেতনা যুগের পর যুগ ধরে চির জাগরুক হয়ে থাকবে।

১০ নভেম্বরের এদিনে জুম্ম জাতি তার সব চাইতে মূল্যবান ও অপূরণীয় সম্পদটি হারিয়েছে। জাতির এ ক্ষতি কোনোদিন পূরণ হবার নয়। প্রয়াত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আন্দোলন সংগ্রামের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, ইতিহাসের প্রতি দক্ষতা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, আইন ইত্যাদি জ্ঞানে গুণান্বিত নেতাকে জুম্ম জাতি আর কোনোদিনই পাবে না। বাস্তব জগতে তাঁর মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু তাঁর আদর্শ ও চেতনা, তাঁর অবদান, তাঁর দেখানো পথ ও তাঁর রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম আমাদের জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজের কাছে যুগ যুগ ধরে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। ১০ নভেম্বরের এদিনে আমাদের জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজকে আরও নতুন করে শপথ নিতে হবে, এই মহান নেতার স্বপ্ন আমরা পূরণ করবোই। ১০ নভেম্বর অমর হোক!

‘পার্বত্য চট্টগ্রাম হল বিভিন্ন জাতিসত্তার ইতিহাস। কেমন করে সেই ইতিহাস আমাদের সংবিধানের পাতায় স্থান পেল না, তা আমি ভাবতে পারি না। সংবিধান হচ্ছে এমন একটা ব্যবস্থা, যা অনগ্রসর জাতিকে, পিছিয়ে পড়া, নির্যাতিত জাতিকে, অগ্রসর জাতির সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে নিয়ে আসার পথ নির্দেশ করে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে এই পেশকৃত সংবিধানে আমরা সেই রাস্তার সন্ধান পাচ্ছি না।’

–মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

বান্দরবানে বন্দুকযুদ্ধ: আইএসপিআরের 'চোরের মায়ের বড় গলা'

প্রীতিবিন্দু চাকমা

গত ২ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাতে বান্দরবানের রুমার প্রত্যন্ত অঞ্চলে কথিত সশস্ত্র গ্রুপের আস্তানায় সেনাবাহিনীর চোরাগুপ্ত হামলা পরিচালনা করতে গিয়ে সেনাবাহিনীর সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার পদবীর একজন ক্যাম্প কম্যান্ডার মারা যান এবং আরেকজন সৈনিক আহত হন। এই বন্দুকযুদ্ধে কথিত সশস্ত্র গ্রুপের তিনজন সদস্যও মারা যান বলে জানা যায়।

এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ (আইএসপিআর) পরিদপ্তর ৩ ফেব্রুয়ারি তাৎক্ষণিকভাবে এক প্রেসবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। উক্ত প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে সেনাবাহিনীর সাথে সংঘটিত উক্ত বন্দুকযুদ্ধ 'সন্তু লারমা সমর্থিত জেএসএস মূল দলের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের' সাথে সংঘটিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।

পক্ষান্তরে জনসংহতি সমিতিও এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে 'উক্ত ঘটনার সাথে জনসংহতি সমিতি বা সমিতির কোনো সদস্য জড়িত নয়' মর্মে উল্লেখ করে আইএসপিআরের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে নস্যাৎ করা এবং জনসংহতি সমিতির উপর দমন-পীড়নের হীনলক্ষ্যে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে উক্ত ঘটনার সাথে জনসংহতি সমিতিকে জড়িত করা হয়েছে বলে জনসংহতি সমিতি উক্ত প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করে।

সংবাদ মাধ্যমকে পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আইএসপিআর আরো উল্লেখ করে যে, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির অনুচ্ছেদ ঘ এর ধারা অনুযায়ী সকল অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দেওয়ার মাধ্যমে তৎকালীন শান্তিবাহিনী সকল সদস্যের আত্মসমর্পণের শর্ত থাকলেও জনাব সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন জেএসএস তা ভঙ্গ করে চুক্তি সম্পাদনের পরবর্তী সময় হতেই সশস্ত্র সন্ত্রাসী লালন করে আসছে। যদিও প্রায়শ সন্তু লারমা ও তার দল সরকারের বিরুদ্ধে শান্তিচুক্তির শর্ত ভঙ্গ ও বাস্তবায়ন না করার অভিযোগ করে থাকে।'

আইএসপিআরের এই অভিযোগ অনেকটা 'চোরের মায়ের বড় গলা'-এর মতো। সেনাবাহিনী গোড়া থেকেই নিজেরাই পার্বত্য চুক্তি ভঙ্গ করে চলেছে, চুক্তি বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে, সর্বোপরি অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে চুক্তি বিরোধী একের পর এক ষড়যন্ত্র। অথচ সেই সশস্ত্রবাহিনীর মুখপাত্র আইএসপিআর উল্টো জনসংহতি সমিতি ও সমিতির সভাপতি সন্তু লারমার বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ তুলেছে। কি সেলুকাস!

পার্বত্য চুক্তিতে পার্বত্যাঞ্চলের বেসামরিকীকরণ এবং গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা, আনসার, ভিডিপি ও এবিপিএনের সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের বিধান করা হয়। চুক্তি স্বাক্ষরকালে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ৫৪৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প ছিল, জনসংহতি সমিতির তথ্য মতে, উক্ত ক্যাম্পের মধ্যে তিন দফায় মাত্র ১০১টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। অপরদিকে ২০০৯ সাল থেকে অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রয়েছে। এমনকি প্রত্যাহারকৃত অনেক ক্যাম্প পুনরায় স্থাপন করা হয়েছে বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সংবাদে উঠে এসেছে। নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে বিভিন্ন সময় ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি স্বয়ং প্রত্যাহারকৃত ক্যাম্প পুনরায় স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছেন। এ থেকে নিঃসন্দেহে কে চুক্তি ভঙ্গ করছে কিংবা সেনাবাহিনী নাকি সন্তু লারমা চুক্তি ভঙ্গ করছে তা সহজে বুঝা যায়। মোদ্দা কথায় নিঃসন্দেহে বলা যায়, সেনাবাহিনীই এখানে চুক্তি ভঙ্গ করছে। চুক্তি মোতাবেক অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করতে সেনাবাহিনীই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে।

সেনাবাহিনীর এই চুক্তি বিরোধী ভূমিকা এখানেই থেমে নেই। পার্বত্য চুক্তির অন্যতম স্পিরিট ছিল পার্বত্যাঞ্চলে জনগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করা। এলক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা, বিশেষ শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীদের নিজেদের উন্নয়ন নিজেরাই নির্ধারণ করার স্বশাসন কায়েম করাই ছিল চুক্তি মূল চেতনা। কিন্তু চুক্তির এই মূল চেতনাকে লঙ্ঘন করেই সেনাবাহিনীর উদ্যোগে সরকার কর্তৃক চুক্তি-উত্তর কালে ২০০১ সালে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে এক প্রকার সেনাশাসন জারি করা হয়। উক্ত 'অপারেশন উত্তরণ'-এর বদৌলতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, বিচারব্যবস্থা, উন্নয়ন কার্যক্রম, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ হেন বিষয় নেই যা সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ করছে না। তাহলে কে পার্বত্য চুক্তি ভঙ্গ করছে?

পার্বত্য চুক্তিতে বিধান ছিল তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড, তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃংখলা ও উন্নয়ন, পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিওদের কার্যাবলী, ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান ইত্যাদি বিষয়সমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করবে। কিন্তু আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে সেই সাধারণ প্রশাসন,

আইন-শৃংখলা ও উন্নয়ন কার্যক্রম কার অঙ্গুলী হেলনে পরিচালিত হচ্ছে? 'অপারেশন উত্তরণ'-এর বদৌলতে সেনাবাহিনীর অঙ্গুলী হেলনেই বস্তুত সেসব বিষয়াদি পরিচালিত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে আজ কার্যত সেনাবাহিনীর হাতে বর্গা দেয়া হয়েছে। সেনাবাহিনী তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের (যেমন পর্যটন শিল্প) জন্যই আজ জুম্মদের হাজার হাজার একর জায়গা-জমি জবরদখল করছে, আদিবাসী জুম্মদেরকে স্ব স্ব ভূমি ও গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করছে, পার্বত্যাঞ্চলের বনাঞ্চল ও জীব-বৈচিত্র্য ধ্বংস করছে। তাহলে কারা চুক্তি বিরোধী ভূমিকা পালন করছে? আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান সন্তু লারমা নাকি সেনাবাহিনী চুক্তি বিরোধী কাজ করছে এখানে তা আর নতুন করে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়ে না।

প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের বিভিন্ন সময়ে ইস্যুকৃত পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম-বিদ্বেষী নির্দেশনা দেখলেই তা সহজে বুঝা যায়। গত ২৯ আগষ্ট ২০২১ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারের পক্ষে মেজর এইচ এম মোহাইমিন বিল্লাহ চৌধুরীর স্বাক্ষরিত এক সার্কুলেশনে জুম (হলুদ/আদা) চাষ বন্ধে পার্বত্যবাসীর জীবন-জীবিকা বিরোধী নির্দেশনা প্রদান করা হলো সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের এধরনের সর্বশেষ অপতৎপরতা। এর আগে ২০১৫ সালের ৭ জানুয়ারি নিরাপত্তা বাহিনীর উদ্যোগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ও বর্ণবাদী ১১ দফা নির্দেশনা জারি করা হয়েছিল। পার্বত্য চুক্তির অব্যবহিত পর থেকে সেনাবাহিনী পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করতে একের পর এক ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে অনেক সেনা অফিসার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকায় নিবন্ধ লিখে থাকেন। তার অন্যতম উদাহরণ হলো ২৪তম আর্টিলারি ব্রিগেড এবং গুইমারা রিজিয়নের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ তোফায়েল আহমেদ, পিএসসি, চাকরিরত অবস্থায় পার্বত্য চুক্তি এবং জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে একটি নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ লেখেন, যা জুলাই-আগস্ট ২০১৫ সালে দৈনিক পূর্বকোণ, বাংলাদেশ প্রতিদিন এবং যায় যায়দিন ইত্যাদি জাতীয় দৈনিক প্রকাশিত হয়েছিল।

জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনীর সকল সদস্য অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছিলেন। শান্তিবাহিনীও বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছিল। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে অত্রাঞ্চলে ইনসার্জেন্সী শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেনাবাহিনীই রাষ্ট্রীয় অস্ত্র শক্তির জোরে 'শান্তকরণ প্রকল্প' নামে চুক্তি-পূর্ব সময়ের কাউন্টার-ইনসার্জেন্সী কার্যক্রম চুক্তি-উত্তর সময়েও চালু রেখেছে। এই প্রকল্পের অধীনে সেনাবাহিনী প্রতিবছর ১০,০০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য পেয়ে থাকে। কাউন্টার-ইনর্জেন্সীর কার্যক্রম হিসেবে উক্ত খাদ্যশস্যের টাকা দিয়ে সেনাবাহিনী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জুম্মদের মধ্যে কিছু তাবেদারী সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে ভরণ-পোষণ, আশ্রয়-প্রশ্রয় ও মদদ দিয়ে থাকে। উক্ত প্রকল্পের টাকা দিয়ে সেটেলার বাঙালিদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ এবং শিক্ষা-স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, উগ্র জাতীয়তাবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক সেটেলার সংগঠনগুলোকে অর্থ সহায়তা দিয়ে চুক্তি বিরোধী কার্যক্রম ও জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলার মদদ দিয়ে চলেছে। তাহলে কে চুক্তি বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে? নিঃসন্দেহে বলা যায় সেটা সেনাবাহিনী।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা হলো রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যা, যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বয়ং মুখে হলেও স্বীকার করেন। তাই এই সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু সমস্যার সেই রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধান না করে কে বা কারা পূর্বের স্বৈরশাসক তথা সামরিক শাসকদের মতো ব্যাপক সামরিকায়নের মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যাকে সামরিক উপায়ে তথা দমন-পীড়নের মাধ্যমে সমাধানের ষড়যন্ত্র করে চলেছে? বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সেই ফ্যাসীবাদী নীতির অনুসারী হচ্ছে দেশের দেশপ্রেমিক(?) সেনাবাহিনী। শেখ হাসিনা সরকারের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে সেনাবাহিনীই সেই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করে চলেছে। তাই ভূতের মুখে রাম নাম মানাই না।

আইএসপিআরে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়েছে যে, 'বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে তৎপর চারটি আঞ্চলিক দল হত্যা, গুম, চাঁদাবাজি ইত্যাদি দুষ্কৃতিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে পাহাড়ের নিরীহ সাধারণ মানুষের জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।' কিন্তু ইউপিডিএফ, সংস্কারপন্থী জেএসএস, ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক), মগ পার্টি, বমপার্টি খ্যাত কেএনএফ ইত্যাদি সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠনের জন্মদাতা, ইন্ধনদাতা, আশ্রয়-প্রশ্রয় দাতা যে সেনাবাহিনীসহ চুক্তি বিরোধী বিশেষ মহল তা আজ নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

পার্বত্য চুক্তি অনুসারে ১৯৯৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি জনসংহতি সমিতির প্রথম অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনী ও পুলিশের নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে ইউপিডিএফ চুক্তি বিরোধী ব্যানার, ব্যানার টানানোর লম্বা বাঁশ ও অন্যান্য সামগ্রী কিভাবে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামের ভেতরে নিয়েছিল, তা একটু নিখুঁতভাবে অনুসন্ধান করলেই তা সহজেই বুঝা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো এলাকায় সেনাবাহিনীর মদদ ও গভীর ষড়যন্ত্র না থাকলেও এটা যে কখনোই সম্ভব নয়, তা সহজেই অনুমেয়। আর পরবর্তী সময়ে একটা পর্যায় পর্যন্ত সেনা ক্যাম্পের লাগোয়া কালেকশন পোষ্ট বসিয়ে সেনাবাহিনীর নাগের ডগায় ইউপিডিএফের চাঁদাবাজি, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, খুন ইত্যাদি সন্ত্রাসী তৎপরতা সেনাবাহিনীর প্রশ্রয় ও মদদ না থাকলে যে কখনোই সম্ভব নয়, তা একটি কচি শিশুরও বুঝতে বাকি নেই।

অপরদিকে সেনাবাহিনী কর্তৃক সংস্কারপন্থী ও ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সশস্ত্র সদস্যদের রাঙ্গামাটি জেলার সুবলং, লংগদুর তিনটিলা, দীঘিনালার বাবুছড়া, রাঙ্গামাটির জীবতলী, বান্দরবানে বালাঘাটা ও শহরে ভাড়া বাসাসহ বিভিন্ন স্থানে এবং মগ পার্টি সন্ত্রাসীদের রাজস্থলীর পোয়াইতু পাড়ায় সশস্ত্রভাবে মোতায়েন রেখে জনসংহতি সমিতির সদস্য ও চুক্তি সমর্থকসহ সাধারণ লোকের উপর সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে। সেনাবাহিনী অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীর খোঁজে প্রায়ই নিরীহ জনগণকে হয়রানি ও নির্যাতন করে থাকে। কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোকে জেএসএস সংস্কারপন্থী, ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক), মগপার্টির সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ঘোরাফেরা করলেও এবং ক্যাম্প স্থাপন করে স্থায়ীভাবে অবস্থান করে থাকলেও সেনাবাহিনীর চোখে ধরা পড়ে না। এ থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সেনাবাহিনীই পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ঘোলাটে করে তুলছে ও পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে রেখেছে।

আইএসপিআরে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরো এক অদ্ভূত বিষয় অবতাড়না করা হয়েছে তা হলো, 'সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ হতে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন জুম্মল্যান্ড সৃষ্টির পায়তারা করছে, যা নিঃসন্দেহে দেশদ্রোহিতার শামিল।' বস্তুত জুম্মল্যান্ড ফোবিয়া সেনাবাহিনীরই সৃষ্টি ও আবিষ্কার। সেনাবাহিনীর এটা একটা ষড়যন্ত্রমূলক কৃত্রিম ভার্চুয়াল যুদ্ধ। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের দাবিতে আন্দোলনরত কোনো সংগঠন বা দলের এই ধরনের কোনো বাস্তব রাজনৈতিক কর্মসূচির অস্তিত্ব না থাকলেও সেনাবাহিনী এটা নিয়ে ভার্চুয়ালি কাল্পনিক প্রচার যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। সেনাবাহিনী একদিকে জুম্মদের নামে ফেসবুক ও পেইজ খুলে ভার্চুয়ালি জুম্মল্যাণ্ডের কর্মসূচি, মানচিত্র, পতাকা, মুদ্রা, সরকার ইত্যাদি কৃত্রিম ইস্যু সৃষ্টি করে ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে, অপরদিকে তার বিরুদ্ধে নানামুখী অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্র করে চলেছে। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের দাবিতে আন্দোলনরত ব্যক্তিবর্গ, অধিকার কর্মী ও সংগঠনগুলোকে ক্রিমিনালাইজ করার (সন্ত্রাসী হিসেবে লেবেল দেয়ার) জন্যই সেনাবাহিনী এধরনের ষড়যন্ত্র করে চলেছে এবং এই কাল্পনিক ফোবিয়া অবতাড়নার আশ্রয় নিয়েছে। পক্ষান্তরে চোরের মায়ের মতো সেনাবাহিনীই সন্তু লারমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা বা রাষ্ট্র বিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে থাকে। এটাই হচ্ছে বাস্তব সত্য।

পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণকে অধিকার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রতারণা করা হলো। চুক্তি বাস্তবায়ন করা হলো না। প্রতারিত সেই জনগোষ্ঠী যদি ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্রোহের আগুনে জ্বলে উঠে তাহলে সেই জনগোষ্ঠীকে কি বেশি দোষ দেয়া যাবে? সেই জনগোষ্ঠীকে কি চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত করা যাবে। কখনোই নয়। চুক্তি ভঙ্গ সেই পক্ষ করছে যে পক্ষ চুক্তি করেও চুক্তি বাস্তবায়ন করেনি। আর সেই পক্ষ হচ্ছে সরকার পক্ষ।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, গণতন্ত্র কখনোই সামরিক শক্তির উপর ভর করে টিকে থাকতে পারে না। গণতন্ত্র জনগণের শক্তির উপর ভর করে টিকে থাকে। ইতিহাসের দুর্ভাগ্য যে, বাংলাদেশের একের পর এক শাসকগোষ্ঠী বরাবরই জনগণের শক্তির উপর নির্ভর না করে সেনাবাহিনীর শক্তির উপর ভর করে টিকে থাকার চেষ্টা করে থাকে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সেনাবাহিনীকে খুশী রাখতে ও সেনাবাহিনী লাভের খোরাক যোগাতে দেশের প্রত্যেক শাসকগোষ্ঠী/সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে সেনাবাহিনীর হাতে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়ে থাকে, যা এক সময় সেই শাসকগোষ্ঠী/সরকারের বুমেরাং হয়ে থাকে। আজকে বর্তমান সরকার পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবর্তে পূর্বের স্বৈরশাসকদের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক সামরিকায়নের মাধ্যমে দমন-পীড়নের মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যার সমাধানের নীতি গ্রহণ করেছে, তার জন্য এই সরকারকে একদিন চড়া মূল্য দিতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

> দেশকে আমি যেভাবে ভালোবেসেছি, যেভাবে আমার মনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছি, যেভাবে আমি কোটি কোটি মানুষের একজন হয়ে দেখেছি, সেইভাবে এই মহান গণপরিষদে বলেছি।
>
> *সংবিধান-বিলের উপর ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে এম এন লারমার গণপরিষদে প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ*

পার্বত্য চট্টগ্রামে শাসকগোষ্ঠীর শাসন ও রাজনীতি প্রসঙ্গে কিছু কথা

আবুমং মারমা

১.

পাহাড়ে শাসকগোষ্ঠী যে রাজনীতি গ্রহণ করেছে তা হলো, হয় জুম্ম জাতিকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণ (Ethnic Cleansing), না হয় জুম্মদেরকে তাদের ভূমি থেকে বিতাড়িত করে জুম্ম শূন্য পাহাড় গড়া। এই নীতিকে ঘিরে শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন কলা-কৌশল অবলম্বন করে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চল শাসন করতে থাকে।

সাধারণ মানুষ যারা মনে করেন, আমরা তো জুমচাষী (যারা জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে) মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ হয়ে পাহাড়ে কী হচ্ছে, কী হচ্ছে না- সে খবর রেখে কী করবো। জুম চাষ করে দু'মুঠো ভাত খেতে পারলেই হয়। রাজনীতি আমাদের পোষায় না, আমরা ঐ সব ঝুট-ঝামেলায় থাকতে চাই না। তারা জানেন না যে, তারা পাহাড়ে কী ঘটছে, কী না ঘটছে, খবর না রাখলেও তারা রাজনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, রাজনীতি তাদের জীবনমান, জীবন-জীবিকা, নিরাপত্তা সব ঠিক করে দিচ্ছে।

দেশ যেভাবে চলছে, দেশকে যেভাবে চালানো হচ্ছে, তাকে কপালের লিখন বা বিধাতার বিধান মনে করে অকপটে মেনে নেওয়াও এক ধরনের রাজনীতি; আবার এর প্রতিবাদ করাও আরেক রাজনীতি। এছাড়া পাহাড়ে যারা শাসকগোষ্ঠীর শোষণমূলক ও অগণতান্ত্রিক শাসননীতি মেনে নিয়েছে বা সহ্য করে চুপচাপ বসে আছে এটাও এক ধরনের তাদের রাজনীতি। আবার মেনে নিতে বা সহ্য করতে না পেরে যারা শাসকগোষ্ঠীর শাসননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাটাও রাজনীতি। বস্তুত শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে নীতি-পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে, সেটাই রাজনীতি। এটাও শাসিতের রাজনীতি। তাহলে আমরা দেখবো, মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামে দুই ধরনের রাজনীতি চলছে। এক. শাসকের রাজনীতি ও দুই. শাসিতের রাজনীতি। অর্থাৎ শাসকের রাজনীতি ও শাসিতের রাজনীতি এক নয় - যতক্ষণ সমাজে শাসক ও শাসিত এই দু'শ্রেণির অস্তিত্ব থাকবে। তাদের মধ্যে সকল ক্ষেত্রে বিরাট পার্থক্য থাকবে।

শাসকের রাজনীতি বলতে সরকার তথা রাষ্ট্রযন্ত্র পাহাড়ের ক্ষেত্রে যেসব নীতি-কৌশল গ্রহণ করেছে। আর এইসব নীতিকে বাস্তবায়িত করার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র বিভিন্ন কলা-কৌশল গ্রহণ করে থাকে। যেমন, জুম্ম নারীদের ওপর যৌন সহিসংতা, উন্নয়নের নামে জুম্মদেরকে তাদের চিরায়ত বাস্তুভিটা-ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা, নিরাপত্তার নামে জুম্মদের ভূমি জোরপূর্বক বেদখল করে ক্যাম্প সম্প্রসারণ, দারিদ্রতার সুযোগে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে জুম্মদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরকরণ ইত্যাদি।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পাহাড়ে শাসকগোষ্ঠী রাজনীতি হলো প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি। এই রাজনীতি বর্তমানে ফ্যাসীবাদী শক্তির রূপ নিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের জন্য এক সময় গণতান্ত্রিক ভূমিকার ভান করলেও, বর্তমানে একটি প্রতিক্রিয়াশীল রূপ নিয়েছে। জুম্মদের অধিকারের সনদ 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি'কে পূর্ণাঙ্গ ও দ্রুত বাস্তবায়ন না করে, তার বিপরীত ক্রমে চুক্তির লঙ্ঘনের কার্যক্রমে লিপ্ত হয়েছে। চুক্তি বিরোধী কার্যক্রমে লিপ্ত হয়েছে। রাষ্ট্রযন্ত্র চুক্তি বিরোধী কার্যক্রম নিয়ে যে ছঁক এঁকেছে, তা মূলত শোষণের জন্য শাসন, জুম্মদের অস্তিত্ব বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র।

দুই. ঠিক এর বিপরীতে চলছে জুম্মদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের রাজনীতি। যা শাসিতের রাজনীতি। জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শুরু থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি জুম্ম জনগণকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। বর্তমানও দিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও জুম্ম জনগণকে চূড়ান্ত লক্ষ্য তথা শোষণমুক্ত বৈষম্যমুক্ত জুম্মদের সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নেতৃত্ব দিয়ে যাবে। একমাত্র জনসংহতি সমিতি প্রগতিশীল মতাদর্শ, মানবতার আদর্শ ও সঠিক রাজনৈতিক লাইন নিয়ে জুম্ম জাতির জাতীয় মুক্তির আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

২.

পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের কি কোনো নিশ্চিত ভবিষ্যৎ আছে? জীবনের কোনো নিরাপত্তার নিশ্চয়তা আছে? অবশ্যই সেই পরিবেশ নেই। তাহলে জাতির কাজে যুক্ত হলে, অধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনীতির সাথে যুক্ত হলে কেন ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে?

পাহাড়ে জুম্মদের অনিশ্চিত ভবিষ্যত ও নিরাপত্তাহীন জীবন হচ্ছে শাসকগোষ্ঠীর সৃষ্ট একটি অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ। আর শাসকগোষ্ঠীর সৃষ্ট অনিশ্চিত ভবিষ্যত ও নিরাপত্তাহীন জীবনের এই পরিবেশকে বদলিয়ে জুম্মদের নিশ্চিত ভবিষ্যত ও নিরাপদ জীবনের পরিবেশ সৃষ্টি করতেও রাজনীতি প্রয়োজন। সেই রাজনীতি হচ্ছে জুম্মদের

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনীতি, অধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনীতি। জুম্ম জাতির নিশ্চিত ভবিষ্যত ও নিরাপদ জীবন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে জুম্মদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা জরুরী। এটিই হচ্ছে বর্তমানে জুম্মদের একটি মহৎ কাজ, আর এই মহৎ কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিটি জুম্ম নর-নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাই, জাতির এই মহৎ কাজে যুক্ত হলে, অধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনীতির সাথে যুক্ত হলে ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে - এই চিন্তাধারাটি মারাত্মক ভুল। বরঞ্চ, আমরা যদি জাতির মুক্তি সংগ্রামে যুক্ত হতে না পারি, অধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনীতিতে যদি যুক্ত হতে না পারি, তাহলে আমরা একদিন পাহাড় থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বস্তুত পাহাড়ে জুম্ম সমাজের প্রত্যেক নর-নারী রাজনীতি করুক বা না করুক, রাজনীতি পছন্দ করুক বা না করুক, চান বা না চান, আমরা কেউ এই দু'ধারার রাজনীতির প্রভাবমুক্ত নয় বা বাইরে থাকতে পারি না, পারবো না।

৩.

প্রসঙ্গত বর্তমানে বান্দরবানে শাসকগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত শাসননীতি বা রাজনীতির কলা-কৌশল নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজনবোধ করছি। বান্দরবানে জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনরত সংগঠন তথা পিসিজেএসএস'র সংগঠনের সাথে যুক্ত নেতৃত্ব, ব্যক্তি ও সর্মথকদের শূন্য করার নীতি গ্রহণ করেছে শাসকগোষ্ঠী। এই নীতিকে ঘিরে বিভিন্ন কলা-কৌশল প্রয়োগ করে রাজনীতি পরিচালিত করছে শাসকগোষ্ঠী।

এই কলা-কৌশলের মধ্যে যেটা প্রধান তা হচ্ছে জুম্মদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সাথে যুক্ত সংগঠন, নেতৃত্ব, ব্যক্তি ও সর্মথকদেরকে খারাপ (চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী ট্যাগ লাগিয়ে) হিসেবে চিহ্নিত করে শাসকগোষ্ঠীর রাজনীতির ন্যায্যতা দিয়ে মানুষের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা হয়। একজন স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনকারীকে বিনা অপরাধে ধরপাকড় করে তাকে চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী, দেশদ্রোহী ইত্যাদি ট্যাগ লাগিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তাঁকে অপরাধী হিসেবে গণ্য করার চেষ্টা করা হয়। তারপর তাকে বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় জড়িত করে জেলে প্রেরণ করা হয়। যার ফলে গণতান্ত্রিক পরিবেশ না থাকায় যারা জুম্ম জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সাথে যুক্ত আছে, তারা নিরাপত্তার অভাবে আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে নসাৎ করার জন্য তার বিপরীত দল হিসেবে সংস্কারপন্থীদের সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় সরাসরি খাগড়াছড়ি থেকে বান্দরবানে আনা হয়। সংস্কারপন্থীরা শাসকগোষ্ঠী গৃহীত নীতি বাস্তব রূপ দিতে ব্যর্থ হলে, এরপর মারমা লিবারেশন পার্টি (মগপার্টি)-কে রাজস্থলী থেকে বান্দরবানে সরাসরি কার্যক্রম চালাতে মোতায়েন করা হয়। বিশেষ করে রোয়াংছড়ি উপজেলার ২নং তারাছা ইউনিয়ন তথা বেতছড়া মৌজায় একটি অস্থায়ী ঘাঁটি স্থাপন করে মগ পার্টির সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়। জনসর্মথন না থাকায়, সে উদ্যোগটিও ব্যর্থ হয়। ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) দলকেও একই উদ্দেশ্যে খাগড়াছড়ি থেকে বান্দরবানে আনা হয়। তাদের কার্যক্রম আপাতত সদর ভিত্তিক কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। তাদের কার্যক্রম বলতে আপাতত চাঁদা তোলা ও মানুষজনকে হুমকি প্রদান করা, আর শাসকগোষ্ঠীর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা। তাদের মধ্য দিয়ে বান্দরবানে পরিবেশ অশান্ত করা ও ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করা।

নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক এক বাঙালি ব্যবসায়ী বলেছিলেন, 'বান্দরবানে প্রশাসনের নাকের ডগায়, সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় সংস্কারপন্থী, ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক), মগপার্টির লোকেরা চাঁদা তুলতে কীভাবে সাহস পায়'। এই কথাটি থেকে বুঝতে পারি, কে এদের আশ্রয়দাতা!

আর শেষমেশ 'কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট' (বম পার্টি নামে খ্যাত) নামক একটি সশস্ত্র গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ ঘটানো হয়। এই দলটি চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠী তথা জনসংহতি সমিতিকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে উস্কানি ও মদদ দেয়া হয়।

রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য পাহাড়ের আন্দোলন দমিয়ে রাখা এবং পাহাড়িদের বিভক্ত করে শাসন-শোষণ চালিয়ে যাওয়া। বিভক্ত করে জুম্মদের আন্দোলনের শক্তিকে দুর্বল করে ফেলা। শাসকগোষ্ঠী তার প্রয়োজনে সৃষ্টি করে, লালন করে এবং কৌশলে তাতে ইন্ধন যোগায়। জুম্মদের মধ্যে আলাদা আলাদা জাতীয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টি করে জাতিগত বিভেদ করে ভূঁইফোড় সংগঠন সৃষ্টি করে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দেওয়া, শাসন-শোষণ করা, আর ঐক্য শক্তিকে দুর্বল করা। ইদানিং সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় মগ পার্টির নতুন সদস্যদের সামরিক প্রশিক্ষণের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হতে দেখা যায়। সেখানে মারমা ভাষা দিয়ে বলা হয় যে, জেএসএসকে মারার জন্য কমান্ডো ট্রেনিং চলছে। রাজস্থলী গ্যাইন্দা ইউনিয়নের অন্তর্গত পোয়াইতু পাড়া হচ্ছে মগ পার্টির প্রধান সামরিক ঘাঁটি। পোয়াইতু পাড়াতে মগ পার্টির সদস্যরা পরিবারসহ রয়েছে বলে জানা যায়। পোয়াইতু পাড়ায় তাদের ক্যাম্পে সেনাবাহিনী তথা প্রশাসনের নাকের ডগায় মগ পার্টির সামরিক প্রশিক্ষণ চলছে। প্রশিক্ষণ ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও ভাইরাল করা হয়। অথচ প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করে চলেছে।

অপরদিকে পিসিজেএসএসের ছাত্র সংগঠন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ'-এর বিপরীতে শাসকগোষ্ঠী সৃষ্টি করে নিলো ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক)'-এর নেতৃত্বে 'পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ'। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিভিন্ন অর্থ ও সহযোগিতার লোভ দেখিয়ে বা বিভিন্ন চাপের মধ্যে ফেলে তাদের বিভিন্ন কমিটিতে যুক্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। বিশেষ করে দূর-দূরান্ত থেকে পড়তে আসা মেঘলায় টেকনিকাল স্কুল এন্ড কলেজে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের অনিচ্ছা সত্বেও চাপ প্রয়োগ করে তাদেরকে কমিটিতে যুক্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। আর তারা যখন সংগঠনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও চরিত্র জানতে পেরে কমিটি থেকে অব্যাহতি দিতে চায়, তখন তাদেরকে মেরে ফেলা, বিভিন্নভাবে হুমকি দেয়া হয় বলে জানা যায়।

পরিশেষে বলতে চাই, সাতে-পাঁচে থাকবো না, আমি নিউট্র্যাল (নিরপেক্ষ) - এই চিন্তাধারা ভুল। ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা এর মধ্যে নিউট্র্যাল বলে কিছু থাকতে পারে না। রাজনীতি বললেই ভাবা উচিত কোনো শ্রেণির প্রতিনিধিত্বশীল রাজনীতি। মানে কোনো ধরনের রাজনীতি। শাসকের রাজনীতি না, শাসিতের রাজনীতি।

তাই প্রশ্ন হচ্ছে, শাসকগোষ্ঠীর নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে জুম্ম জাতিকে ধ্বংসের কার্যক্রমে সামিল হবেন? কিংবা শাসকগোষ্ঠীর প্রয়োজনে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মগ পার্টি, সংস্কারপন্থী, ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক), কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট দলের সাথে যুক্ত হয়ে জুম্ম জাতির সাথে বেঈমানি ও বিশ্বাসঘাতকতা করবেন? নাকি মানবতার আদর্শ, প্রগতিশীল মতাদর্শ নিয়ে জুম্ম জাতির জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে যুক্ত পিসিজেএসএস পার্টির সাথে একাত্ম হয়ে যুব সমাজের ওপর অর্পিত ঐতিহাসিক মহৎ দায়িত্ব পালন করে জাতিকে মুক্তি এনে দিবেন? সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন আপনি স্বয়ং।

পার্বত্য চট্টগ্রামের যুব সমিতির নেতৃবৃন্দ রাঙ্গামাটিতে শহীদ বেদীতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করছেন

কেবল রাজনৈতিক সমাধানেই পার্বত্যাঞ্চলে শান্তি ফিরবে

মঙ্গল কুমার চাকমা

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করলেই ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে কেবল উন্নয়নের মোড়ক দিয়ে কিংবা সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি-হানাহানির আবরণ দিয়ে আইন-শৃঙ্খলার চশমা দিয়ে দেশবাসীর নিকট তুলে ধরা হয়। বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা কোনো অর্থনৈতিক সমস্যা কিংবা আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটি রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যা, যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর অনেক বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। তাই রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের উদ্দেশ্যে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি (জুম্ম) অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের লক্ষ্যেই ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বস্তুত এটাই ছিল পার্বত্য চুক্তির মূল স্পিরিট।

তারই ভিত্তিতে পার্বত্য চুক্তির 'খ' ও 'গ' খন্ডে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা এবং এসব পরিষদে সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ, আইন-শৃঙ্খলা, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন (রিজার্ভ বন ব্যতীত) ও পরিবেশ, সকল উন্নয়ন কার্যক্রমসহ রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও কার্যাবলী হস্তান্তরেরও বিধান করা হয়েছে।

চুক্তির সেসব বিধানাবলী অনুসারে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে সত্য, কিন্তু বিগত আড়াই দশকেও এসব পরিষদের নিকট উল্লেখিত প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক এখতিয়ার ও কার্যাবলী ন্যস্ত করা হয়নি। এমনকি তিন পার্বত্য জেলার স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন পূর্বক এসব পরিষদের নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়নি। অন্যদিকে চুক্তিতে অউপজাতীয় (বাঙালি) স্থায়ী বাসিন্দার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের এখতিয়ার কেবলমাত্র সার্কেল চীফের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু চুক্তির এই বিধান লঙ্ঘন করে ডেপুটি কমিশনারদেরও স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের এখতিয়ার প্রদান করা হয়েছে। চুক্তির এসব মৌলিক বিষয় যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় একদিকে যেমন পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান অর্জিত হয়নি, অন্যদিকে তেমনি আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত পার্বত্যবাসীর স্বশাসনও গড়ে উঠেনি।

অধিকন্তু পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খন্ডে ভূমি কমিশনের মাধ্যমে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করে জুম্মদের বেহাত জায়গা-জমি ফেরত দেয়া ও বহিরাগতদের নিকট প্রদত্ত সকল ইজারা বাতিল; ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদেরকে তাদের জায়গা-জমি প্রত্যর্পণ পূর্বক পুনর্বাসন করা; 'অপারেশন উত্তরণ'সহ নিরাপত্তা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকরিতে পাহাড়িদের অগ্রাধিকার দিয়ে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্যদিকে অলিখিত চুক্তিতে সেটেলার বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এসব বিষয়সমূহ হয় আংশিক বাস্তবায়ন করে অথর্ব অবস্থায় রেখে দেয়া হয়েছে কিংবা সম্পূর্ণ অবাস্তবায়িত রেখে নানাভাবে পদদলিত করা হচ্ছে।

পার্বত্য সমস্যা সমাধানের নামে সরকারের পক্ষ থেকে প্রায়ই পার্বত্য চট্টগ্রামে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সভা আয়োজন করা হয়ে থাকে। এসব সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের পার্বত্যবাসীর জনদাবিকে ধামাচাপা দিয়ে শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, সংঘাতের বিষয়টিকে ব্যাপকভাবে তুলে ধরা হয়ে থাকে। এসব সভায় পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়টাকে প্রাধান্য না দিয়ে চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনরত সংগঠন ও অধিকারকামী জুম্ম জনগণকে সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সাথে লিপ্ত থাকার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত অভিযোগ তুলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া ও ধ্বংস করার কার্যক্রম গ্রহণ ও হুমকি প্রদান করা হয়ে থাকে।

তারই হুবহু প্রতিফলন ঘটতে দেখা গেছে গত ২৫ মে রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক বিশেষ সভা ও ২৬ মে এপিবিএনের আঞ্চলিক কার্যালয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। উক্ত সভায় চট্টগ্রামের ২৪ পদাধিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল মোঃ সাইফুল আবেদীন বলেন যে, পার্বত্য চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে মাত্র ২টি ধারা ছিল জনসংহতি সমিতির পালনযোগ্য। সেই দু'টি ধারা অনুসারে জনসংহতি সমিতির তৎকালীন সদস্যরা সকল অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দেননি এবং সকল সশস্ত্র সদস্য সারেন্ডার করেননি বলে অভিযোগ করা হয়। অথচ পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনে উক্ত দু'টি ধারা সম্পূর্ণরূপে 'বাস্তবায়িত হয়েছে' বলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। এ থেকে সহজেই বুঝা যায়, শর্ষের মধ্যেই ভুত রয়েছে।

আর সর্বশেষ একই আওয়াজ তুলতে দেখা গেছে গত ১৬ জুন জাতীয় সংসদের ২০২২-২৩ অর্থবৎসরের বাজেটের উপর

সাধারণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনের সাংসদ দীপংকর তালুকদারের বক্তব্যে। তিনি বলেছেন, 'শান্তিচুক্তিতে কোথাও লেখা নাই পরিত্যক্ত সেনাক্যাম্পগুলোতে পুলিশ বসানো যাবে না।' কিন্তু পার্বত্য চুক্তিতে যা লেখা নেই তা তুলে ধরতে তাঁকে সোচ্চার হতে দেখা গেলেও চুক্তিতে যা লেখা আছে তা যথাযথভাবে তুলে ধরতে ও তা বাস্তবায়নের দাবি তুলে ধরতে তাঁকে সেভাবে সক্রিয় হতে দেখা যায়নি। যেমন পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খন্ডের ১৭(খ) ধারায় 'সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করার' যে বিধান রয়েছে, চুক্তির সেই বিধান সম্পর্কে যথাযথভাবে তুলে ধরতে সাংসদ মহোদয়কে দেখা যায়নি।

পার্বত্য চুক্তির এই ধারা অনুসারে এসব জায়গায় কোনো বাহিনী মোতায়েনের কোনো সুযোগ নেই। পার্বত্য চুক্তির সেই বিধানাবলী সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়ে তিনি কেবল একপেশে বক্তব্য ও চুক্তির মনগড়া ব্যাখা দিয়েছেন, যার পশ্চাতে ছিল এবিষয়ে অন্ধকারে রেখে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করা।

সাংসদ মহোদয় আরো বলেছেন, 'শান্তিচুক্তিতে আছে অপ্রয়োজনীয় সেনাক্যাম্প গুটিয়ে আনা হবে।' তাঁর এই বক্তব্যও ছিল সম্পূর্ণ বিকৃত, মনগড়া ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। কেননা চুক্তিতে 'অপ্রয়োজনীয় ক্যাম্পগুলো' নয়, 'সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রামপ্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প' স্থায়ী নিবাসে ফিরিয়ে নেয়ার কথা রয়েছে।

আরো উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চুক্তির 'খ' খন্ডের ৩৪(খ)নং ধারায় 'পুলিশ (স্থানীয়)' বিষয়টি এবং ৩৩(ক)নং ধারায় 'জেলার আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন' সংক্রান্ত বিষয়টি তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরের বিধান করা হয়েছে এবং ২৪(ক) নং ধারায় 'পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন' মর্মে উল্লেখ রয়েছে।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির এযাবত অনুষ্ঠিত পাঁচটি সভার মধ্যে প্রথম চারটি সভায় পার্বত্য চুক্তির উক্ত বিধানাবলী অনুসারে নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে 'পুলিশ (স্থানীয়)' ও 'আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন' বিষয় হস্তান্তর করা ও অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা, পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন মোতাবেক পার্বত্য জেলা পুলিশ বাহিনী গঠন করা ইত্যাদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য, চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির ৫ম সভায় প্রত্যাহারকৃত অস্থায়ী ক্যাম্পের স্থলে পুলিশ ক্যাম্প বসানোর প্রস্তাব করা হলেও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি।

অথচ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির প্রথম চারটি সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করে কমিটির ৫ম সভার প্রস্তাবিত বিষয়টি বাস্তবায়নের যুক্তি দেখিয়ে ১৩ এপ্রিল ২০২২ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার্স থেকে প্রত্যাহৃত সেনা ক্যাম্পের জায়গায় এবিপিএন ক্যাম্প স্থাপনের নির্দেশনা জারি করা হয়।

এছাড়া প্রত্যাহৃত সেনা ক্যাম্পের জায়গাগুলো প্রকৃত মালিকের নিকট কিংবা সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর না করে রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক সেসব জায়গায় 'নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য নির্ধারিত স্থান', 'উক্ত স্থানে কোনো প্রকার স্থাপনা নির্মাণ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ও দন্ডনীয় অপরাধ' ইত্যাদি উল্লেখ করে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেয়া হচ্ছে।

বলাবাহুল্য পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের ব্যর্থতাকে ধামাচাপা দিয়ে কিংবা চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের উপর প্রাধান্য না দিয়ে সভা-সমাবেশে, আইন-শৃঙ্খলা মিটিং-এ কিংবা জাতীয় সংসদে সরকার কর্তৃক উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি-হানাহানির ইস্যুকে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা হচ্ছে এবং এপিবিএন কিংবা সেনা ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে পার্বত্যাঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনার উদ্যোগী হতে দেখা যাচ্ছে।

বস্তুত ম্যালেরিয়া রোগকে যদি যক্ষ্মা রোগের ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়, তাহলে রোগ কখনো কমবে না। বরঞ্চ সেই রোগের প্রাদুর্ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পার্বত্যাঞ্চলের রাজনৈতিক সমস্যাকেও এপিবিএন কিংবা অন্য কোনো বাহিনী মোতায়েন করে সমাধানের উদ্যোগ নেয়া মানেই হচ্ছে ম্যালেরিয়াকে যক্ষ্মার ঔষধ দিয়ে ভুল চিকিৎসা করার সামিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। বস্তুত এপিবিএন কিংবা অন্য কোনো বাহিনীর ক্যাম্প বসিয়ে নয়, পার্বত্য চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের মধ্য দিয়েই কেবল পার্বত্যাঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ফিরে আসবে এবং বিদ্যমান সংঘাত-হানাহানিও নিঃসন্দেহে বন্ধ হবে।

আগ্রাসনের করাল গ্রাসের মুখে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী!

সজীব চাকমা

বাংলাদেশে বর্তমানে 'এক দেশে দুই বা ততোধিক শাসন' চলমান রয়েছে। দেশের সমতল অঞ্চলে এক শাসন, অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক শাসন এবং জুম্ম জনগণকে দমন-পীড়ন, ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদকরণ। বহিরাগত বাঙালি বসতিস্থাপনকারীদের বেলায় এক নীতি, জুম্ম জনগণের বেলায় আরেক নীতি। অবশ্য সমতল অঞ্চলেও আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদেরকে দমন, পীড়ন, লুণ্ঠন ও উচ্ছেদ নীতি থেমে নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মসহ দেশের সমতলের আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আজ পরিষ্কারভাবে সরকার ও রাষ্ট্রযন্ত্রের বিমাতাসুলভ আচরণের শিকার। এজন্য বেশি ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না, পদে পদে দৈনন্দিন নানা ঘটনাই প্রতিনিয়ত এসবের প্রমাণ হাজির করছে। বস্তুত আদিবাসীদের ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কোনো দাবি-দাওয়া ও মতামতই সরকার ও রাষ্ট্রযন্ত্র গ্রাহ্য, গ্রহণ ও সম্মান করতে রাজি নয়।

সরকার ও রাষ্ট্রযন্ত্রের এই আচরণ ও ভূমিকাকে ঔপনিবেশিক আগ্রাসন ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। সরকার ও রাষ্ট্রযন্ত্রের যে দৃষ্টিভঙ্গি, ভূমিকা, আচরণ, মনোভাব, ভাবভঙ্গী, ইশারা-ইঙ্গিত, অঙ্গ-ভঙ্গি, ভাষা, বক্তব্য, কাজের ধরণ, কার্যক্রম, কর্মসূচি ইত্যাদি সবকিছু উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি কর্তৃক স্থানীয় মানুষের উপর অন্যায় আগ্রাসন, আধিপত্য, নির্মম শাসন-শোষণ, লুণ্ঠন, উচ্ছেদ ও ধ্বংসযজ্ঞের ঘৃণ্য কাহিনীকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। শুধু শক্তি প্রয়োগের পন্থা, পদ্ধতি ও কৌশলের কিছু পার্থক্য মাত্র। সেই সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের মতই বর্তমান বাংলাদেশ সরকার ও রাষ্ট্রও আদিবাসী জুম্মদের অধিকার হরণ করে আধিপত্য নিশ্চিত করতে চায়, পদানত করতে চায়, শাসন-শোষণ করতে চায়, ধর্মান্তরিত করতে চায়, নিজভূমিতে পরবাসী করতে চায় এবং তাদের ভূ-সম্পত্তি, ভূখন্ড, প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্য, পাহাড়, ঝর্ণা, নদী-ছড়া, জীববৈচিত্র্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, আত্মপরিচয় ইত্যাদি সবকিছু হরণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে চায়।

বলাবাহুল্য, সরকার ও রাষ্ট্রযন্ত্রের নজিরবিহীন মিথ্যাচার, অপপ্রচার, প্রচার মাধ্যমের উপর হস্তক্ষেপ, নিয়ন্ত্রণ ও হুমকির কারণে সাদাসিধা চোখে, বাইরে থেকে ও ভাসাভাসাভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের এই সাম্প্রতিক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিকে সহজে অনুধাবন করা যায় না। এমনকি খোদ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করেও যারা কেবল ব্যক্তিগত ও নিজস্ব পারিবারিক গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ তাদের পক্ষেও এই নিবিড় আক্রমণাত্মক আগ্রাসনের গ্রাসকে বোঝা কঠিন।

বাংলাদেশে ৫৪টির অধিক যে সংখ্যালঘু জাতিগুলোকে দেখতে পাওয়া যায় তাদেরকে বহু আগে থেকেই অন্যান্য জাতিগত পরিচয়ের পাশাপাশি 'আদিবাসী' হিসেবেও অভিহিত করা হয়ে আসছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রেই ধরা যাক। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, উক্ত শাসনবিধির তফসিলে উল্লেখিত বিভিন্ন আইনসমূহের মধ্যে দি ইন্ডিয়ান ইনকাম ট্যাক্স এ্যাক্ট ১৯২২, দি ইন্ডিয়ান ফিনান্স এ্যাক্ট ১৯৪১, দ্য ফরেস্ট এ্যাক্ট ১৯৭২, ১৯৮৪ সালের আয়কর আইন প্রভৃতির ক্ষেত্রেও 'আদিবাসী পাহাড়ি' (indigenous hillmen) শব্দটি, ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইনে আদিবাসী (aborginal) উল্লেখ করা হয়। বেশ কয়েক বছর ধরে, এমনকী সাম্প্রতিক কালেও সরকারের পক্ষ থেকে এবং সরকারি বিভিন্ন দলিলে বাঙালি জনগোষ্ঠী ব্যতীত বাংলাদেশে বসবাসকারী অন্যান্য ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীগুলোকে 'আদিবাসী' বলে অভিহিত করা হয়ে আসছিল।

শুধু তাই নয়, এযাবৎ মূলধারার বাঙালি সুধীজন, বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক, লেখক, গবেষক, প্রগতিশীল মানুষ প্রায় সকলেই নির্দ্বিধায় বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মানুষকে আদিবাসী হিসেবেই অভিহিত করে আসছেন। আর বাংলাদেশের আদিবাসীরা হুট করে নিজেরাই নিজেদেরকে 'আদিবাসী' বলে দাবি করে বসেনি। জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৯৩ সালকে 'বিশ্বের আদিবাসী জনগণের আন্তর্জাতিক বর্ষ', ৯ আগস্টকে 'আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস' এবং ১৯৯৫ সাল হতে ২০০৪ সাল সময়কে 'বিশ্বের আদিবাসী জনগণের প্রথম আন্তর্জাতিক দশক' হিসেবে ঘোষণার পর থেকে বিশ্বের ও দেশের অপরাপর আদিবাসীদের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণও এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে আসছে। সেই থেকেই এই পরিচয়টি আরও অধিকতর সামনে আসতে থাকে। বলাবাহুল্য, এদেশে আদিবাসীদের 'আদিবাসী' হিসেবে অভিহিত করা ছাড়াও, জাতিসংঘ নির্ধারিত বৈশিষ্ট্যাবলী অনুযায়ী নিঃসন্দেহে তারাই আদিবাসী। আশির দশকের মাঝামাঝি জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক গবেষক মার্টিনেজ কোবোও বাংলাদেশে যাদেরকে সরকারি ভাষায় উপজাতি বা ট্রাইবাল বলা হয়ে থাকে তারা 'আদিবাসী হিসেবে বিবেচিত' বলে উল্লেখ করেন।

কিন্তু আদিবাসীদের অধিকার হরণ, পদদলিত ও অস্বীকার করার সরকার ও রাষ্ট্রযন্ত্রের একটি হাস্যকর ও দূরভিসন্ধিমূলক কৌশল বা পন্থা হল আদিবাসীদের 'আদিবাসী' হিসেবে অস্বীকার করা। অর্থাৎ সরকার ও রাষ্ট্রযন্ত্রের ভাবখানা এমন– দেশে যদি আদিবাসীই না থাকে তাহলে আদিবাসীদের অধিকারের প্রশ্নই ওঠে না, জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত 'আদিবাসী বিষয়ক ঘোষণাপত্র'ও অনুসরণ করার প্রশ্ন ওঠে না। কারণ আদিবাসী বিষয়ক ঘোষণাপত্রে আদিবাসীদের জন্য যে সকল অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে, তাতে এদেশে আদিবাসী আছে স্বীকার করলে বর্তমানে যেভাবে চলছে সেভাবে আদিবাসীদের আগ্রাসন চালানো যাবে না, আদিবাসীদের ভূমি, ভূখন্ড, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, আত্মপরিচয়, স্বশাসন ইত্যাদির উপর যত্রতত্র, সকাল-বিকাল হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর এ এক অভিনব অস্বীকারের সংস্কৃতি। এটা হচ্ছে- দেখেও না দেখা, জেনেও না জানা, জেগে থেকেও ঘুমিয়ে থাকার ভান করার মত। বর্তমান সরকারের এজন্য বিচার না হলেও আদিবাসীদের অস্বীকার করার ভূমিকা নিয়ে শেষ পর্যন্ত যে তাকে সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা, বঞ্চনাকারী ও নিপীড়কের কলঙ্ক তিলক পড়ে ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে তা নিশ্চিত। কারণ এই অস্বীকারের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ এদেশের আদিবাসী জুম্ম জনগণের ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত অধিকারসমূহ হরণ ও পদদলিত করার প্রতিক্রিয়াশীল কর্মকান্ডকেই উৎসাহিত করবে। এক কথায় আদিবাসীদের 'আদিবাসী' হিসেবে অস্বীকৃতি সরকার ও রাষ্ট্রযন্ত্রের আধিপত্যবাদী নীতি এবং আদিবাসীদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার ষড়যন্ত্র বৈ কিছু নয়।

পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন বন্ধ

পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ১৯৯৭ সালে যে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়, সেই চুক্তির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। এই চুক্তি সম্পাদন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সরকার দেশে-বিদেশে প্রায়ই কৃতিত্বের দাবি করেন। কিন্তু দীর্ঘ ২৫ বছর অতিক্রান্ত হলেও চুক্তির অধিকাংশ বিষয় এখনো অবাস্তবায়িতই রয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি (জুম্ম) অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে আইনী ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন ও পরিবেশ, পর্যটন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদিসহ রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও কার্যাবলী হস্তান্তর করা হয়নি, নির্বাচন বিধিমালা ও স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন পূর্বক আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা হয়নি, 'অপারেশ উত্তরণ' নামক সেনাশাসনসহ সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়নি, ভূমি কমিশনের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করে বেদখল হওয়া জায়গা-জমি জুম্মদের নিকট ফেরত দেওয়া হয়নি, ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের স্ব স্ব জায়গা-জমি প্রত্যর্পণ পূর্বক যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়নি, অস্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত ভূমি ইজারা বাতিল করা হয়নি, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকুরিতে জুম্মদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ প্রদান নিশ্চিত করা হয়নি, চুক্তির সাথে সঙ্গতি বিধানকল্পে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য অন্যান্য আইন সংশোধন করা হয়নি, পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে বাঙালি সেটেলারদের সম্মানজনক পুনর্বাসন করা হয়নি ইত্যাদি।

বিশেষ করে চুক্তি স্বাক্ষরকারী এই আওয়ামী লীগ সরকার গত ২০০৯ সালে থেকে একনাগাড়ে ১৩ বছরের অধিক সময় ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকেও চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া প্রায় বন্ধ রেখেছে এবং মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। এমনকি চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক এবং জুম্মদের স্বার্থ পরিপন্থী অহরহ প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে চলেছে।

পার্বত্য চুক্তি লংঘন

সরকার পক্ষ প্রথম চুক্তির শর্ত লংঘন করে 'স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র' প্রদানের এখতিয়ার সার্কেল চীফের পাশাপাশি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও মনগড়াভাবে ডেপুটি কমিশনারদেরও সনদপত্র প্রদানের ক্ষমতা দেয়ার মাধ্যমে। ২১ ডিসেম্বর ২০০০ তারিখ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক চুক্তির শর্ত লংঘন করে এ সংক্রান্ত একটি নির্বাহী আদেশ জারি করা হয়। ঐ সনদপত্র ব্যবহার করে পার্বত্যাঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা নয় এমন অনেক ব্যক্তি স্থানীয়দের অধিকার খর্ব করে বিশেষত চাকরি, জমি বন্দোবস্ত, ঋণগ্রহণ, ভোটার তালিকাভুক্তি, কোটা ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে চলেছেন। বারবার দাবি করা সত্ত্বেও সরকার এখনো পর্যন্ত তা প্রত্যাহার বা সংশোধন করেনি।

এরপর সরকার কর্তৃক পার্বত্য চুক্তি লংঘনের চেষ্টা দেখা যায় ২০০১ সালে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন' প্রণয়ন করার মধ্য দিয়ে। এই সময় সরকার আইনটিতে চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক ধারা অন্তর্ভুক্ত করে। ফলে চুক্তির অন্যতম পক্ষ জনসংহতি সমিতি চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে আইনটি প্রণয়নের দাবিতে আন্দোলন করতে বাধ্য হয়। প্রায় ১৫ বছর পর বহু সময় নষ্ট করে সরকার ২০১৬ সালে আইনটি সংশোধন এবং চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রণয়ন করে। কিন্তু

এরপর বিগত প্রায় ৬ বছরেও সরকার ভূমি কমিশন আইনের বিধিমালা প্রণয়ন করেনি। সেই ২০১৭ সালে ১ জানুয়ারিতে আঞ্চলিক পরিষদ ভূমি কমিশনের বিধিমালা খসড়া তৈরি করে ভূমি মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে। অথচ সরকার এখনো তা চূড়ান্ত করেনি। এই হচ্ছে সরকারের চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার হাল। তাহলে কীভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি হবে, সমস্যার সমাধান হবে?

এছাড়াও সরকার চুক্তির বিধান লংঘন করে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শকে উপেক্ষা করে একতরফাভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৪, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ২০১৪, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ইত্যাদি প্রণয়ন করে। চুক্তি অনুযায়ী ২০০৯ সালে অস্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত ভূমি ইজারা বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু পরে আবার চুক্তি লংঘন করে অধিকাংশ পুনর্বহাল করা হয়। জানা যায়, কিছু প্লট কাগজেকলমে বাতিল করা হলেও এখনো সেসব প্লট লীজ গ্রহীতাদের দখলে রয়েছে। সম্প্রতি বান্দরবানের লামা, আলীকদমসহ বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় আদিবাসীদের সাথে এইসব লীজ গ্রহীতাদের প্রায়ই ভূমি নিয়ে বিরোধের খবর পাওয়া যায়। এইসব লীজ গ্রহীতা ভূমিদস্যুদের কর্তৃক আদিবাসীদের ভূমি বেদখল ও উচ্ছেদ করার কথা জানা যায়।

চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সকল অস্থায়ী ক্যাম্পসহ সেনাশাসন প্রত্যাহার করার কথা। জনসংহতি সমিতির তথ্য মোতাবেক ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচশত অস্থায়ী ক্যাম্প থেকে মোট ১০১টি সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু এরপর আর প্রত্যাহার করা হয়নি। উপরন্তু চুক্তি লংঘন করে আরো ২০টির অধিক ক্যাম্প পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। সর্বশেষ সরকার একতরফাভাবে ও চুক্তি লংঘন করে প্রত্যাহারকৃত ক্যাম্পসমূহে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

সেনাশাসন জোরদারকরণ

পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের পরিবর্তে বর্তমান সরকার পূর্ববর্তী স্বৈরশাসকদের ন্যায় সামরিক উপায়ে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের নীতিই গ্রহণ করেছে। পার্বত্য চুক্তির পরও সেনাবাহিনী 'শান্তকরণ প্রকল্প' নামে কাউন্টার ইনসার্জেন্সী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। এই প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ১০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মুসলিম সেটেলারদের সংগঠিতকরণ, গুচ্ছগ্রাম সম্প্রাসারণ, স্বাস্থ্য-শিক্ষা খাতে ব্যয় করে থাকে। জোরদার করা হয়েছে সেনা কর্তৃত্ব, সেনাশাসন, সেনা অভিযান, সেনা হস্তক্ষেপ, দমন, পীড়ন, নির্যাতন, মিথ্যা মামলা, জেল-জুলুমসহ হত্যা পর্যন্ত। সেনাবাহিনীরই ষড়যন্ত্রে জনসংহতি সমিতির অধিকাংশ কেন্দ্রীয় সদস্যসহ জেলা, থানা পর্যায়ের বহু নেতাকর্মীকে মিথ্যা মামলায় জড়িত করে হয়রানি করা হচ্ছে। রাতে-বিরাতে সন্ত্রাস বিরোধী ও টহল অভিযানের নামে গ্রামে গ্রামে নিরীহ জনগণের বাড়িতে তল্লাসী চালানো হচ্ছে, জিনিসপত্র তছনছ করা হচ্ছে, বাড়ির লোকদের নানাভাবে হয়রানি, হুমকি প্রদানসহ মারধর ও আটক করা হচ্ছে।

কার্যত পার্বত্য চট্টগ্রামকে আবার সেনাকর্তৃত্ব ও সেনাশাসনের হাতে তুলে দিয়েছে সরকার। বর্তমানে ৪০ জন জুম্ম-এর পেছনে নিরাপত্তা বাহিনীর একজন সেনা সদস্য নিয়োজিত রয়েছে। গত ২৬ মে ২০২২ রাঙ্গামাটিতে এপিবিএনের আঞ্চলিক কার্যালয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল মোঃ সাইফুল আবেদীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সামনেই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে ও জুম্মদের বিরুদ্ধে উস্কানি ও হুমকিমূলক এবং উদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন, যা ব্যাপক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এসময় তিনি জুম্মদেরকে সেনাবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধেরও আহ্বান করেন। তিনি মনগড়াভাবে বলেন, জনসংহতি সমিতি তার পালনীয় চুক্তির মাত্র ২টি ধারাও বাস্তবায়ন করেনি এবং পাহাড়িদের উদ্দেশ্য করে বলেন, আসো যুদ্ধ করি। তোমরা কয় হাজার আসবে? এক, দুই, তিন হাজার! তোমরা ২০/৩০ মিনিটও টিকতে পারবে না।

গত ৭ জানুয়ারি ২০১৫ নিরাপত্তা বাহিনীর রিপোর্টের ভিত্তিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর ১১টি বর্ণবাদী নির্দেশনা জারি করা হয়, যেখানে বলা হয়েছে, সেনাবাহিনী অথবা বিজিবির উপস্থিতিতেই দেশি-বিদেশি ব্যক্তি কিংবা সংস্থা পার্বত্য অঞ্চলে জুম্মদের সাথে সাক্ষাৎ কিংবা বৈঠক করতে পারবে। গত ১৯ জুলাই ২০২২ 'সদর দপ্তর প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিচালকের ০৪.০৭.২০২২ তারিখের ২২ সংখ্যকপত্র' বরাত দিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক আদিবাসী দিবসের টকশো-তে অংশগ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ এবং সংবাদপত্রের সম্পাদকসহ সুশীল সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহার না করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এধরনের বহু উদাহরণ পাওয়া যাবে, যেখানে সামরিক বাহিনী, গোয়েন্দা বাহিনী হস্তক্ষেপ করে থাকে। সম্প্রতি সেনাবাহিনী আবার আদিবাসীদের সামাজিক ব্যবস্থায় নগ্ন হস্তক্ষেপ স্বরূপ হেডম্যান-কার্বারি সম্মেলন, মুরং সম্মেলন নিয়মিতভাবে আয়োজন করে চলেছে। বিভিন্ন এলাকায় বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের ক্ষেত্রেও নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা ও হয়রানি করে চলেছে।

এছাড়া সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা বাহিনী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে অনলাইন মিডিয়াসহ সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সংবাদকর্মীদের

নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা প্রায় সর্বজনবিদিত। বহু অভিযোগ আছে, সেনাবাহিনী ও তাদের মদদপুষ্ঠ কোনো গোষ্ঠী কর্তৃক কোনো মানবাধিকার লংঘন বা গণবিরোধী কোনো ঘটনা সংঘটিত হলে সেসব খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রায়ই সেনাবাহিনী বা গোয়েন্দা বাহিনীর পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ বা সেন্সর করা হয়ে থাকে। এমনকি কোনো কোনো সময় কোনো কোনো সেনা কর্মকর্তা কর্তৃক স্থানীয় বিভিন্ন সংবাদকর্মীকে সেনা কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে গিয়ে নানা হুমকিসহ নানা নির্দেশনা দেয়া হয়।

সন্ত্রাসী ষড়যন্ত্র

আদিবাসীদের অধিকারের আন্দোলনকে ও তাদের জাতিগতভাবে দূর্বল করার লক্ষ্যে সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা বাহিনী কর্তৃক 'ভাগ করো, শাসন করো' কৌশল হিসেবে ইউপিডিএফ, জেএসএস (এম এন লারমা) সংস্কারপন্থী, ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক), মগপার্টি, বম পার্টি খ্যাত কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) ইত্যাদি সশস্ত্র সংগঠন সৃষ্টি ও আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে তাদের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে খুন, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়সহ এক অরাজক পরিস্থিতি ও ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক এসব গোষ্ঠীকে লালন-পালন ও মদদ দিয়ে এলাকায় ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে, সেই রাষ্ট্রীয় বাহিনীই আবার পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন আঞ্চলিক দলসমূহ সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি করছে বলে ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছে। সেই অজুহাতে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনধারার সকল ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপ করে চলেছে। তাদের এইসব কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপের এবং সশস্ত্র গোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করা এবং চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলনরত জনসংহতি সমিতি, তার সহযোগী সংগঠন এর নেতাকর্মী ও সমর্থকদের দমন-পীড়ন করা। সেনাবাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসনের মদদেই চুক্তির পরেও বাঙালি সেটেলারদের কর্তৃক জুম্মদের উপর ২০টির অধিক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে। এসব হামলায়ও বহু জুম্ম নরনারী হতাহত, শত শত বাড়িঘর ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভস্মীভূত, ধ্বংসপ্রাপ্ত ও লুটপাটের শিকার হয়। এসব ঘটনার কোনোটিরই যথাযথ বিচার হয়নি।

উন্নয়ন আগ্রাসন

সরকার একদিকে চুক্তি বাস্তবায়ন বন্ধ রেখে চুক্তি বিরোধী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, সেনাশাসন ও সেনাকর্তৃত্ব জোরদার করেছে, চুক্তির অপর পক্ষ জনসংহতি সমিতির উপর দমন-পীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে এবং চুক্তির পূর্বের সকল আগ্রাসনকে পৃষ্টপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে, অপরদিকে তথাকথিত উন্নয়নের নামে জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। বলাবাহুল্য, চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন এবং আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদ নিয়ে স্থাপিত বিশেষ শাসনব্যবস্থা কার্যকরকরণ ব্যতীত জুম্মসহ স্থানীয় জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হতে পারে না। তাই স্থানীয় জনগণের যথাযথ ক্ষমতায়ন নিশ্চিত না হলে সরকারের কোনো উন্নয়নই আদিবাসীসহ স্থানীয়দের স্বার্থে ব্যবহৃত হবে না। আদিবাসী বা স্থানীয়দের নামে হওয়া এসব উন্নয়ন শেষ পর্যন্ত উন্নয়ন আগ্রাসনেই পর্যবসিত হতে বাধ্য।

উন্নয়ন আগ্রাসনের আরো একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হল- স্থানীয় ম্রো জনগোষ্ঠীসহ দেশে-বিদেশে নানা জনের ও সংগঠনের ব্যাপক প্রতিবাদ ও নিন্দার ঝর বয়ে গেলেও সেনাবাহিনী ও সিকদার গ্রুপ কর্তৃক বান্দরবান পার্বত্য জেলার চিম্বুক পাহাড়ে ফাইভ স্টার হোটেল ও বিনোদন পার্ক নির্মাণ চালিয়ে যাওয়া। যে ফাইভ স্টার হোটেল ও বিনোদন পার্ক নির্মিত হলে আদিবাসীদের আনুমানিক ১০০০ একর ভোগদখলীয় ও চাষের ভূমি বেদখল, ৬টি পাড়া সরাসরি উচ্ছেদ এবং ১১৬টি পাড়ার আনুমানিক ১০ হাজার বাসিন্দার ঐতিহ্যবাহী জীবিকা, চাষের ভূমি, ফলজ বাগান, সংরক্ষিত পাড়াবন ও জীববৈচিত্র্য, পবিত্র জায়গা, শশ্মান ঘাট ও পানির উৎসগুলো ব্যাপকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হবে অভিযোগ রয়েছে। এ পর্যন্ত জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও ব্যক্তিত্ব চিম্বুক পাহাড়ে ফাইভ স্টার হোটেল ও বিনোদন পার্ক নির্মাণ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ বাংলাদেশ সরকারের নিকট চিঠি প্রেরণ করেন। প্রগতিশীল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, উন্নয়ন সংস্থা, আদিবাসী সংগঠন ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, বিভিন্ন নেতা, বুদ্ধিজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এই ফাইভ স্টার হোটেল ও বিনোদন পার্ক নির্মাণ বাতিল করার দাবি ও আহ্বান জানান। কিন্তু এরপরও সেনাবাহিনী ও সিকদার গ্রুপ তাদের কাজ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

বস্তুত আদিবাসীদের বসতভূমি, জুমভূমি, জমি-জমা, পাহাড়, বাগান-বাগিচা, ঐতিহ্যগত ভূমি ও ভূখন্ড আজ সরকার, রাষ্ট্রীয় বাহিনী ও সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রভাবশালী মহলের উন্নয়ন আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে আদিবাসীরা অচিরেই নিজেদের ভূমিতে নিজেরাই সংখ্যালঘুতে ও পরবাসীতে পরিণত হবে এবং ক্রমে তাদের উচ্ছেদ প্রক্রিয়াই জোরদার হবে।

ইসলামীকরণ

পার্বত্য চট্টগ্রামে শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয় সেই ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান আমলে। কিন্তু সেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশেও ইসলামীকরণের কার্যক্রম বন্ধ হয়নি। বরং রাষ্ট্রযন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা ও সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহায়োগিতায় একদিকে অনুপ্রবেশ এবং অন্যদিকে এই ইসলামীকরণ আরো

নীরব ও নিবিড়ভাবে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এমনকি ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চুক্তির পরও তা থেমে থাকেনি। সরকারি বিভিন্ন দপ্তর ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মুসলিম নয় এমন আদিবাসী কর্মকর্তা কর্মচারী বা জনগণকে জনাব, বেগম পরিচিতি চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন স্থানের নামকরণ এবং এমনকি আগে থেকে প্রচলিত কোনো স্থান বা প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে বা মুছে দিয়ে এই এলাকার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত নয় এমন ইসলামী নাম প্রচলন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকার বা শাসকগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত আন্তর্জাতিক আইনে ও বাংলাদেশের সংবিধানে স্বীকৃত আদিবাসী মানুষের সাংস্কৃতিক অধিকার লংঘন বা খর্ব করে চলেছে। যেমন রাঙ্গামাটি শহরের 'সুখীনীলগঞ্জ', 'আমানতবাগ', 'মোহাম্মদপুর' ইত্যাদিসহ আরও বহু স্থানে মুসলিম ব্লক, 'ইসলামাবাদ', 'পাকিস্তান টিলা' ধরনের নানা স্থানের নাম পাওয়া যাবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে মৌলবাদী ও জুম্ম বিদ্বেষী কিছু ইসলামী গোষ্ঠী কর্তৃক সুপরিকল্পিতভাবে আদিবাসীদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হচ্ছে। এধরনের পরিকল্পনা বা কার্যক্রম অনেক আগে থেকে শুরু হলেও সাম্প্রতিককালে এর তৎপরতা অনেক জোরদার হয়েছে বলে জানা গেছে। ধর্মান্তরিতকরণের এই প্রক্রিয়া স্থানীয়ভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় যেমন চলছে, তেমনি ভালো শিক্ষার প্রলোভন দেখিয়ে আদিবাসী জুম্ম শিশুদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে নিয়ে গিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হচ্ছে। ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে ঢাকা ট্রিবিউন, ইউএনপিও, বুডিডস্টডোর.নেট, হেরাল্ডমালয়েশিয়া.কমসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে ও প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি ২০১০ হতে জানুয়ারি ২০১৭ সালের মধ্যে সাত বছরে কেবল পুলিশ কর্তৃক ধর্মান্তরে জড়িত ইসলামী চক্রের হাত থেকে ৭২ জন আদিবাসী জুম্ম শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে।

১ জানুয়ারি ২০১৮ সালে বান্দরবান জেলার আলিকদম উপজেলার থানচি সড়ক ১১ কিমি এলাকায় ১৪টি অসহায় ও গরিব পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা দেওয়ার নাম করে গোপনে উপজাতীয় মুসলিম আর্দশ সংঘ ও দাওয়াতে তাবলীগের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছে। জানা গেছে, বান্দরবান জেলায় 'উপজাতীয় মুসলিম আর্দশ সংঘ', 'উপজাতীয় মুসলিম কল্যাণ সংস্থা' ও 'উপজাতীয় আর্দশ সংঘ বাংলাদেশ' ইত্যাদি সংগঠনের নাম দিয়ে জনবসতিও গড়ে তোলা হয়েছে এবং এসব সংগঠনের মাধ্যমে জুম্মদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণের কাজ চালানো হচ্ছে। একটি সূত্রের মতে, বান্দরবান পৌরসভা, আলিকদম, রোয়াংছড়ি, লামাসহ বিভিন্ন এলাকায় ১০টির অধিক জুম্ম মুসলিম পাড়া বা বসতি রয়েছে। এইসব ধর্মান্তরিত জুম্ম মুসলিমদের বলা হচ্ছে 'নও মুসলিম' বা 'উপজাতি মুসলিম'। এই ধর্মান্তরিত মুসলিম বসতিগুলোকে ঘাটি হিসেবে ব্যবহার করে এবং কিছু বাছাইকৃত নও মুসলিমকে সুবিধা দিয়ে তাদের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত ধর্মান্তরের কার্যক্রম সম্প্রসারণের চেষ্টা চলছে। আলিকদম উপজেলার থানচি সড়ক সংলগ্ন ১১ কিলোমিটার নামক এলাকায় ধর্মান্তরিত মুসলিমদের নিয়ে 'ইসলামপুর' নামে একটি পল্লী গড়ে তোলা হয়েছে। স্থাপন করা হয়েছে 'মুসলিম পাড়া মডেল একাডেমি'। আর এইসব কর্মকান্ড যারা চালাচ্ছেন তাদেরকে স্থানীয় সেনাক্যাম্পের সেনাবাহিনী সহযোগিতা করে থাকে বলে তথ্য রয়েছে।

গত সেপ্টেম্বর (২০২২) মাসের প্রথম সপ্তাহে বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর এলাকায় স্থানীয়সেনা ও উপজেলা প্রশাসন এবং আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ কর্তৃক স্থানীয়মারমা অধিবাসীদের শ্মশানভূমি জবরদখল করে তাতে ১৭টি নও (নব) মুসলিম ত্রিপুরা পরিবারের জন্য বাড়ি নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়। সেনা ও উপজেলা প্রশাসন সরকারের আশ্রায়ন প্রকল্পের আওতায়নও মুসলিম ত্রিপুরা পরিবারগুলোর জন্য এই বাড়ি নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়।

এরপর একই মাসে নিরাপত্তা অজুহাত দেখিয়ে বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন রোয়াংছড়ি উপজেলার আলেক্ষ্যং ইউনিয়নে তুলাছড়িনামক স্থানে নও মুসলিম ত্রিপুরাদের গ্রামের পাশে সেনাবাহিনী একটি নতুন সেনা ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। নতুন ক্যাম্পের পাশে একটি পাকা মসজিদও নির্মাণ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। ক্যাম্প নির্মাণ কাজ শুরুর পর প্রায়ই ক্যাম্পের আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামের জুম্ম গ্রামবাসীদের বিনা পারিশ্রমিকে ও বিনামূল্যে গাছ, বাঁশ ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এনে ক্যাম্পে দিতে হচ্ছে বলে জানা গেছে।

অস্বীকার, মিথ্যাচার ও অপপ্রচার

সরকার ও রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক আদিবাসীদের অধিকার বঞ্চিত করবার, দমন-পীড়ন করবার, মানবাধিকার হরণ ও লংঘনকে ধামাচাপা দেয়ার, জনগণকে প্রতারিত করবার, চুক্তি বাস্তবায়নের দায়বোধ এড়িয়ে যাবার, দেশের ও বিশ্বের মানুষকে বিভ্রান্ত করবার একটি বৃথা চেষ্টা ও অপকৌশল হচ্ছে অস্বীকার করা এবং গোয়েবলসীয় কায়দায় মিথ্যাচার ও অপপ্রচার করা। তাই আদিবাসীদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয় এবং আদিবাসীদের অধিকারকে অস্বীকার করা হয়। তাই সংবিধানে বাংলাদেশের জনগণকে কেবল 'বাঙালি' বলে উল্লেখ করে বাঙালি ভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিগুলোকে অস্বীকার করা হয়। এজন্য নানা মিথ্যা যুক্তি খাঁড়া করা হয়। কিন্তু বাস্তবে যেহেতু তাদের অস্তিত্বহীন করা সম্ভব হয় না, তাই যত পারা যায় নিম্নস্বরে অবজ্ঞায় তুচ্ছজ্ঞানে 'উপজাতি', 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী', 'সম্প্রদায়' ইত্যাদি বলে পরিচয়ের ধাঁধা সৃষ্টি করা হয়। সরকার

ও রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক প্রতিনিয়ত উন্নয়নের কাহিনী প্রচার করা হয়। কিন্তু সেই উন্নয়ন করতে গিয়ে আদিবাসীদের ক্ষতি হচ্ছে কিনা, অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা, তাদের মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে কিনা, পাহাড়ের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিনা, পাহাড়ের আদিবাসীদের জাতীয় অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ছে কিনা, সেসব উন্নয়ন পার্বত্য চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হচ্ছে কিনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো সবসময় ক্ষমতার জোরে ধামাচাপা দেয়া হয়। ২৫ বছরেও যে চুক্তির একটি মৌলিক বিষয়ও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় না, দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে একনাগাড়ে ক্ষমতায় থেকেও যে চুক্তি বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগ নেয়া হয় না সে কথাগুলো স্বীকার করা হয় না। উপরন্তু প্রতিনিয়ত চুক্তি বাস্তবায়িত হচ্ছে, অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়েছে, চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার আন্তরিক, ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে বলে নির্জলা মিথ্যাচার ও অপপ্রচার করা হয়।

শেষ কথা

সরকারের চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী এবং পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের সম্পূর্ণ বিপরীত এসব কর্মকান্ড সরকারের ও রাষ্ট্রযন্ত্রের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিরই প্রত্যক্ষ ফল। এটা কোনোভাবে গঠনমূলক এবং এতদঞ্চলের মানুষের ও দেশের সামগ্রিক স্বার্থে সহায়ক বলে বিবেচনা করা যায় না। এটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের সাথে প্রতারণার সামিল। বলাবাহুল্য, এভাবে আদিবাসী জাতিসমূহের অধিকারকে অস্বীকার করে কখনো দেশে সংহতি ও সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। অপরদিকে পার্বত্য সমস্যার শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক সমাধানের জন্য পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়নেরও বিকল্প নেই। পার্বত্য চুক্তিকে লংঘন করে এবং পার্বত্য চুক্তিতে স্বীকৃত আদিবাসী জুম্মদের অধিকারকে পদদলিত করে কোনোভাবে পার্বত্য সমস্যার সমাধান যেমন সম্ভব নয়, তেমনি যেকোনো উন্নয়ন কর্মকান্ডকেও সুষম ও টেকসই বলে বিবেচনা করা যায় না। সরকারের এই বাস্তবতাটি উপলব্ধি করা জরুরি যে, ষড়যন্ত্র করে কখনো উত্তম সমাধানে পৌঁছা সম্ভব নয়। চুক্তি বাস্তবায়ন ও আদিবাসী জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে আজ যে ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা হচ্ছে, তা একদিন নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্রকারীদের জন্য বুমেরাং হয়েই দেখা দেবে। আদিবাসী জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার ও জাতীয় অস্তিত্বের জন্য লড়াই করেই যাবে। স্বাধীন দেশে এই নির্মম ঔপনিবেশিক আগ্রাসন কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

> আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণও বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের ভাই-বোনদের সাথে একযোগে এগিয়ে যেতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ মনে করে এবং বিশ্বাস করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের যুগযুগান্তের অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা তুলে দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের সংরক্ষণের অধিকার দেবে। – *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

ক বি তা

শোকাবহ ১০ নভেম্বর

সত্যবীর দেওয়ান

তুমি ১০ নভেম্বর,
খ্রিস্টীয় বর্ষপঞ্জীর একাদশ মাসের একটি দিন;
অথচ হয়ে গেলে জুম্ম জাতির শোকের দিন।
না! শুধু শোকের নয়, বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্কময় দিনও।
শুধু তাই নয়! অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে, মহামতি
মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার শ্রেষ্ঠ ত্যাগের দিনও ;
একই সাথে অপর আট সহযোগীরও আত্মদানের দিন।
শুধু কি তাই? না! সহস্র জুম্ম জনতার আত্মত্যাগের
কথা স্মরণেরও একটি মহান দিন।
আর শত শত শহীদ জুম্মবীর সন্তানদেরও
আত্মাহুতির কথা স্মরণের মহান দিন।
এই দিনের তাৎপর্য কি হতে পারে?
কেউ কি কখনো ভেবেছে কোনো দিন?
রক্ত! রক্ত! রক্ত! রক্তদান তথা আত্মবলিদান
ছাড়া অধিকার অর্জন অসম্ভব, এই শিক্ষা
দিয়ে গেছে জুম্ম জাতির মহান স্বপ্নদ্রষ্টা,
জাতীয় চেতনার অগ্রদূত, বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ।
কিন্তু সেদিন বুঝেনি ঘাতকেরা, করেছে কি?
তাই নিক্ষিপ্ত ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে,
পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে।
এ লড়াই যে জুম্ম জাতির বাঁচার লড়াই,
বাঁচতে হবে লড়াই করে, এটাই তাৎপর্য,
এটাই শিক্ষা, আজকের ১০ নভেম্বর ২০২২ এর।

প্রণাম তব

জ্যোতিপ্রভা লারমা মিনু

মাতা পার্বতী, তব গর্ভধারণে
এই পার্বত্য জনপদে, জুম্ম সমাজে
তুমি মোদের যুগ-যুগান্তরের মুক্তিদাতা-
অধিকার হারা জুম্ম জনগোষ্ঠীর।
বিপ্লবী রাজনীতি, জাতীয় চেতনা
শিক্ষার আলো প্রসার, নারী জাতির
ঘুণে ধরা গৃহবন্দী জীবনের মুক্তির বাণী।
অন্ধকার আর অশিক্ষায় নিমজ্জিত
সমাজ ও জাতীয় জীবনে,
সেই অন্ধকার ও অশিক্ষা দূরীভূত করে
নূতন দিনে বেঁচে থাকার আশা নিয়ে,
নিপীড়িত জাতির মাঝে তব আবির্ভাব
ছন্দ নিয়ে এলো মুক্তির কঠোর সংগ্রামে।
১০ই নভেম্বর ১৯৮৩
শোকাবহ মহাপ্রয়াণের দিনে
তোমাকে জানাই মোদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম।

> ‘এই দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা, প্রাণের কথা এখানে (সংবিধানে) প্রতিফলিত হয়নি বলে আমি মনে করি। কৃষকের কথা প্রতিফলিত হয়নি, শ্রমিকের কথা প্রতিফলিত হয়নি, রিক্সওয়ালার কথা প্রতিফলিত হয়নি, মেথরের কথা প্রতিফলিত হয়নি। আজ এদের সবার জীবন, মেথরের জীবন, খেটে-খাওয়া মানুষের জীবন অভিশপ্ত। তাদের কথা, তাদের দাবি এখানে স্থান পায়নি। এই যে অভিশপ্ত জীবন, তাদের কথা আজকে সংবিধানে নাই।’ *– এম এন লারমা*

১০ নভেম্বর

তন্টু চাকমা হিমেল

১০ই নভেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে নেমে আসা এক কালো শোকের ছায়া,
মাতৃত্বের সুরের নিঃশব্দ বিলীন সম্পূরক বাস্তবতা।

১০ই নভেম্বর মানে এক তরুণের বুকে চেতনার দ্রোহ!
হাজারো রুক্ষ চেতনার অমৃতবাণীর জয়ধ্বনি।
১০ই নভেম্বর মাতৃভূমির বুকে লারমার রক্তজমা গল্প।

১০ই নভেম্বর মানে কান্না, দাবানলের জমে থাকা একটি ক্রোধ!
এক আঙুলে পার্বত্য ভূমি কম্পনের ধ্বনি থমকে দেওয়ার এক গল্প।

১০ই নভেম্বর মানে জুমের এক তরুণ বিপ্লবী সাহসী সৈনিকের পথ চলা।
১০ই নভেম্বর মানে আত্মোৎসর্গিত বীর পরিবারের রক্তাক্ত স্রোতের গল্প!
১০ই নভেম্বর মানে চেতনার রক্তে উত্তপ্ত দেহে জ্বলা সেই উদ্যমী রাজপথের ককটেল।

১০ই নভেম্বর মানে বীরের গর্জন দেওয়া শেষের কালোরাত
১০ই নভেম্বর মানে দালালদের ভয়ার্ত মাথানত সন্তাপ।

১০ই নভেম্বর মানে অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে হার না মানা বীরপুরুষ!
১০ই নভেম্বর মানে পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে জমে থাকা শত কালো মেঘের আর্তনাদ
১০ই নভেম্বর মানে বুকের মধ্যে গর্জে ওঠা এম এন লারমার প্রতিবাদ।

> ‘কৃষির উন্নয়নের দিকে যেমন আমাদের নজর দিতে হবে, তেমনি আমাদের শিল্প ও কল-কারখানার দিকেও নজর দিতে হবে। শিল্প ক্ষেত্রে আমরা যেন পিছনে পড়ে না থাকি এবং শিল্পোন্নতিতে আমরা যেন অন্য রাষ্ট্রের বা উন্নতিশীল দেশের সম মর্যাদায় পৌঁছতে পারি, সেদিকে আমাদের চেষ্টা করতে হবে। আমাদের যেসব কল-কারখানা এখনও অকেজো বা অক্ষম হয়ে পড়ে আছে, সেগুলো আস্তে আস্তে কর্মক্ষম করতে হবে এবং ধীরে ধীরে সেগুলিকে উন্নতমানে নিয়ে যেতে হবে। আমরা যেন সব বিষয়ে স্বনির্ভরশীল হতে পারি।’
>
> *– এম এন লারমা*
> *বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনার উপর মতামত,*
> *২৩ জুন ১৯৭৩, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক, খণ্ড ২ সংখ্যা ১৭*

পাহাড়ের নিরব কান্না

ভদ্রাদেবী তঞ্চঙ্গ্যা

তোমরা কি শুনতে পাও
পাহাড়ের নিরব কান্না?
শুনতে পাও কি
পাহাড়ের বিষণ্নতার গল্প?
দেখতে পাও কি
পাহাড়ের হাহাকার দৃশ্য?

সকলে দেখো আর শুনো,
তবে কি পারো অনুভব করতে?
নাকি দেখেও না দেখার,
শুনেও না শুনার বাহানা করো?
এই পাহাড়, এই প্রকৃতি সবই তো আমাদের প্রাণ,
আছে তো সব কিছুতে স্বস্তির নিঃশ্বাস।

কতযুগ ধরে আমাদের এই পাহাড়,
কতযুগ ধরে বসবাস আমাদের।
জন্ম মোদের পাহাড়ে,
সংগ্রাম মোদের পাহাড়ে,
মৃত্যু মোদের পাহাড়ে।

বেঁচে থাকার তাগিদে
কঠোর পরিশ্রমের জুম চাষ,
সারাদিনের পরিশ্রম,
এই আমাদের সংগ্রাম!
তবু নেই কোনো দুঃখ।
চিৎকার করে বলতে চাই,
আমারি মন বিষণ্নতার।
পাহাড় নেই আজ ভালো,
পাহাড়ে জ্বালাও আলো।

শুনতে পাই পাহাড়ের নিরব কান্না,
দেখতে পাই পাহাড়ের মানুষের কষ্টের বন্যা।
চাইনি তো কোনোদিন,
পাহাড়ের বুকে হোক আগ্রাসী পর্যটন,
চাইনি তো কখনো,
চাষাবাদের ভূমিতে হোক ফাইভ স্টার হোটেল,
চাইনি তো কখনো,
বাসস্থানে হোক ক্যাম্প স্থাপন,
আমি নিজ ভূমিতে পরবাসী!

পাহাড় কাঁদে নিরবে,
আমরা কি আজো শুনতে পাই?
পাহাড়ের মানুষের হাহাকার চিৎকার
দেখতে কি পাই?
পাহাড়ের শোষণ, বঞ্চনা, নির্যাতন, অত্যাচার, ধর্ষণ
নেই কোনো শেষ!
আমাদের নেই কোনো স্বাধীনতা।

পাহাড় তো আজ ধ্বংসের মুখে,
বলবে কি তবুও তোমরা?
পাহাড়ের বুকে শান্তি আছে!
পাহাড়ের মানুষ শান্তিতে আছে!

আর কত?
আর নয়তো ঘুমিয়ে থাকার,
জাগতে হবে,
জেগে উঠো, নয়ন খোলো।
চোখ খুলে দেখো, দেখতে পাবে।
বুঝতে শেখো, বুঝতে পারবে।
শুনতে শেখো, শুনতে পাবে।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

নলীন চাকমা

হে মহান নেতা, জুম্ম জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত এম এন লারমা,
প্রথমে তোমাকে জানাই আমি, জুম্ম জাতির পক্ষ থেকে লাখো লাল সালাম।
যখন দেশের শাসকগোষ্ঠী জুম্ম জাতির অস্তিত্ব চিরতরে মুছে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছিল
তখন তুমি ছাড়াও এই পার্বত্য বুকে, ছিল আরো লাখো জুম্ম জনতা
তুমিই একমাত্র ব্যক্তি
যে জুম্ম জাতির মুক্তির সংগ্রামে ধরেছিলে হাল।
জুম্ম জাতির মুক্তির জন্য
অন্তহীন যাত্রাপথে বেছে নিলে সংগ্রামী জীবন।
কখনো ভাবনি তুমি, নিজের সুবিধাভোগী বিলাসবহুল জীবন।
তবুও সেই সুবিধাভোগী বিশ্বাসঘাতক, জুম্ম জাতির স্বার্থ বিরোধী
পলাশ-দেবেন-প্রকাশ-গিরিদের ষড়যন্ত্রে
নিজের জীবন বিসর্জন দিলে।
তুমিই সেই ব্যক্তি
জুম্ম জাতিকে উপহার দিয়েছিলে মুক্তির সংগ্রামের পথ।
তোমার প্রগতিশীল চিন্তাধারা আর রাজনীতির অনুপ্রেরণায়
সারা পাহাড়ের অধিকার বঞ্চিত লাখো জুম্ম জনতা
কখনো ছাড়বে না আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগ্রামের রাজপথ।
ভুলি নাই আমরা, ভুলে নাই জুম্ম জাতি
সারা পার্বত্য চট্টগ্রামের সবুজ পাহাড়ের বুকে,
রক্তে লেখা এই নাম
এম এন লারমা।
তোমাকে জানাই আমার লাল সালাম।

‘আমাদের দাবি ন্যায়সঙ্গত দাবি। বছরকে বছর ধরে ইহা একটি অবহেলিত শাসিত অঞ্চল ছিল। এখন আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রামকে গণতান্ত্রিক পৃথক শাসিত অঞ্চল অর্থাৎ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে বাস্তবে পেতে চাই।’

—মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

বিশেষ প্রতিবেদন

প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর হয়রানি ও নির্যাতন

১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রামে ইনসার্জেন্সীর অবসান হলেও সরকার চুক্তি-পূর্ব সময়ে জারিকৃত 'অপারেশন দাবানল'-এর স্থলে ২০০১ সালে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে সেনাশাসন জারি করে। 'অপারেশন উত্তরণ'-এর ক্ষমতা বলে সেনাবাহিনী চুক্তি-পূর্ব সময়ের মতো প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, উন্নয়ন, বিচার ব্যবস্থাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। অপরদিকে চুক্তি-পূর্ব কাউন্টার ইনসার্জেন্সীর কার্যক্রম হিসেবে গৃহীত সেনাবাহিনীর 'শান্তকরণ প্রকল্প'ও চুক্তি-উত্তর সময়ে অব্যাহত রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের অধীনে সেনাবাহিনীকে প্রতি বছর ১০,০০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ দেয়া হয়। এসব বরাদ্দ মুসলিম সেটেলারদেরকে পার্বত্য চুক্তি বিরোধী কার্যক্রমে সংগঠিতকরণ, গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা কার্যক্রম ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হয়ে আসছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের বিধান থাকলেও ৫৪৫টি অস্থায়ী ক্যাম্পের মধ্যে চুক্তির পর তিন দফায় মাত্র ১০১টি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। চুক্তি লঙ্ঘন করে বর্তমানে অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের পরিবর্তে প্রত্যাহৃত ক্যাম্পের জায়গায় নতুন নতুন ক্যাম্প বসানো হচ্ছে। কোভিড মহামারীর সময়ও ২০টি নতুন সেনা ক্যাম্প বসানো হয়েছে। গত ১৩ এপ্রিল ২০২২ এপিবিএন সদর দপ্তরের ইস্যুকৃত এক সার্কুলেশনের মাধ্যমে প্রত্যাহৃত সেনা ক্যাম্পের জায়গায় এপিবিএন ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গত ২৬ মে ২০২২ রাঙ্গামাটিতে এপিবিএনের আঞ্চলিক কার্যালয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চাঁদাবাজি ও সশস্ত্র তৎপরতার অভিযোগ এনে আন্দোলনরত জনসংহতি সমিতিকে সম্মুখ যুদ্ধের আহ্বান এবং ৩০ মিনিটের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করার হুমকি প্রদান করেন ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল সাইফুল আবেদীন।

বস্তুত অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিস অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মূলহোতা হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলে সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নসহ দেশের সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ভূমিকা পালন করে থাকে।

সেনাবাহিনীর কর্পোরেট ব্যবসা পার্বত্য চট্টগ্রামেও ব্যাপক আকারে সম্প্রসারিত হচ্ছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পর্যটন ও পাঁচ তারকা হোটেল ব্যবসা। সেনাবাহিনী তাদের সেই পর্যটন ও হোটেল ব্যবসা জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণ ও অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে চলেছে। সেই পর্যটন ও হোটেল ব্যবসার নামে সেনাবাহিনী দ্বারা তিন পার্বত্য জেলায় জুম্মদের বংশ পরম্পরায় ভোগদলীয় হাজার হাজার একর পাহাড় ভূমি জবরদখল করা হচ্ছে এবং এসব দখলীয় জায়গায় মসজিদ নির্মাণ ও বহিরাগত মুসলমানদের বসতি প্রদান করে চলেছে। সেনাবাহিনী এসব জায়গা-জমিতে জুম্মদেরকে জুম চাষ ও উদ্যান চাষে বাধা দিয়ে চলেছে এবং নানা ভয়ভীতি প্রদর্শন করে এসব জায়গা-জমি থেকে জুম্মদেরকে উচ্ছেদ করে চলেছে। যার সর্বশেষ উদাহরণ হলো বান্দরবানের চিম্বুক পাহাড়ে ম্রো জনগোষ্ঠীর জুমভূমি দখল করে পাঁচ তারকা হোটেল নির্মাণের উদ্যোগ। এতে করে ম্রো জনগোষ্ঠীর ১১৫টি গ্রামের ১০,০০০ জুমচাষীর জীবন-জীবিকা বিপন্ন হতে বসেছে।

গত ২৪-২৫ অক্টোবর ২০২১ ঢাকায় নিযুক্ত ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত মিজ উইনি ইস্ট্রুপ পিটারসেন-এর রাঙ্গামাটি ও চট্টগ্রাম সফরকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুই জেলা প্রশাসককে এক হাস্যকর, ষড়যন্ত্রমূলক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত পরামর্শ প্রদান করে। উক্ত পরামর্শে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তবতায় স্থানীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়টি বেশ স্পর্শকাতর, চাকমা সার্কেল চীফ ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায়স্বাধীন জুমল্যান্ড প্রতিষ্ঠা ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতির দাবী আদায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গোপন তৎপরতায় লিপ্ত, রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলাস্থ হরিণা ইউনিয়নের রাবেতং (ভারতের সীমান্তবর্তী) এলাকা হতে পিসিজেএসএস (সন্তু) এর সশস্ত্র সদস্যরা রাঙ্গামাটি সদরের বিভিন্ন স্থানে অনুপ্রবেশ করত নাশকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান ইত্যাদি উদ্ভূত ও কাল্পনিক অভিমত প্রদান করা হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে এ ধরনের ন্যাক্কারজনক কার্যক্রমের অন্যতম উদহারণ হলো সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাঅধিদপ্তর থেকে ৪ জুলাই ২০২২ আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসকে সামনে রেখে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার অজুহাত দেখিয়ে আদিবাসী শব্দটি ব্যবহারের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা, যা সংবিধানের মৌলিক অধিকার ও বাক-স্বাধীনতা পরিপন্থী এবং বর্ণবাদী ও ষড়যন্ত্রমূলক বিধায় তীব্র প্রতিবাদের মুখে পড়ে। এর আগে ২৯ আগষ্ট ২০২১ পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হলুদ ও আদা চাষ সীমিত করার ব্যাপারে কঠোর নজরদারী বৃদ্ধি করতে এবং

নিরুৎসাহিত করতে আশু পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

বিগত একবছরে (নভেম্বর ২০২১-অক্টোবর ২০২২) নিরাপত্তা বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক ১০৮টি মানবাধিকার লঙ্ঘন ও পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ঘটনা সংঘটিত করা হয়েছে। ১১০টি ঘটনায় কমপক্ষে ২৭৯ জন ব্যক্তি মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হন। তাদের মধ্যে ৫৬ জনকে গ্রেফতার, ২৮ জনকে সাময়িক আটক, ৫ জনকে খুন, ৫৪ জনকে মারধর, ২১ জনকে হুমকি ও হয়রানি, ৪৩টি বাড়ি তল্লাসী, ২২ জনের বিরুদ্ধে সাজানো মামলা দায়ের, ৬টি ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ, সীমান্ত সড়ক ও সংযোগ সড়ক নির্মাণে দুই শতাধিক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত, ২ জুম্ম নারীর উপর শারীরিক ও যৌন সহিংসতা ইত্যাদি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

উচ্চ আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পরও ২৯ নভেম্বর ২০২১ রাঙ্গামাটি জেলার জেল গেইট থেকে সোনারাম তঞ্চঙ্গ্যা (২৮) ও সুজন তালুকদার (৩২) নামে দুইজন জুম্মকে আটক করে সেনাবাহিনী এবং সেনা-মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী দল। ২৮ ডিসেম্বর চেমি ডুলু পাড়া সেনা ক্যাম্পের সেনারা বান্দরবান জেলার রাজভিলা ইউনিয়নের থংজমা পাড়া ও মশাবনিয়া পাড়ার ১৪ জন গ্রামবাসীকে বেঁধে ক্যাম্পে নিয়ে মারধর করে।

সম্প্রতি নিম্নোক্ত নতুন ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে-

১। ২৬ জুন ২০২২ মাটিরাঙ্গা সেনা জোনের প্রায় ৪০ জনের একদল সেনা সদস্য মাটিরাঙ্গা সদর ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের অভ্যা মৌজাস্থ জল কুমার কার্বারি পাড়ায় গিয়ে সেখানে পরিত্যক্ত একটি ক্যাম্পের স্থানে পুনরায় ক্যাম্প স্থাপনের প্রস্তুতি শুরু করে।

২। ২১ জুলাই ২০২২ খাগড়াছড়ির মহালছড়ি উপজেলার লেমুছড়ি মৌজার মাইসছড়ি ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের জয়সেন পাড়ায় একটি সেনাক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

৩। ১০ সেপ্টেম্বর ২০২২ রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলার বগাচতর ইউনিয়নের চিবেরেগা এলাকায় এক বৌদ্ধ বিহার সংলগ্ন জুম্ম গ্রামবাসীদের ভূমি বেদখল করে একটি আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বৌদ্ধ বিহার সংলগ্ন খেলার মাঠ ও তিনজন জুম্ম গ্রামবাসীর ভোগদখলীয় ভূমিও প্রস্তাবিত ক্যাম্পের মধ্যে পড়বে।

৪। ২২ সেপ্টেম্বর ২০২২ সেনাবাহিনী কর্তৃক বান্দরবান সদর উপজেলাধীন কুহালং ইউনিয়নে বৌদ্ধ বিহারের জায়গা বেদখল করে নতুন সেনা ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৫। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ রাঙ্গামাটির জুরাছড়ির ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের কাঠালতলীতে সেনাবাহিনী একটি হেলিপ্যাডসহ সেনাক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বনযোগীছড়া সেনা জোনের অধীন শিলছড়ি সেনা ক্যাম্পের সুবেদার মোঃ রেজাউল কাঠালতুলি এলাকার এক কার্বারিকে উক্ত সেনা ক্যাম্প স্থাপনের কথা জানান।

৬। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ বান্দরবানের রোয়াংছড়ি উপজেলার আলেক্ষ্যং ইউনিয়নে তুলাছড়ি নামক স্থানে নও মুসলিম ত্রিপুরাদের গ্রামের পাশে সেনাবাহিনী একটি নতুন সেনা ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। নতুন ক্যাম্পের পাশে একটি পাকা মসজিদও নির্মাণ করা হচ্ছে।

এসময়ে সেনাবাহিনী কর্তৃক বাড়ি তল্লাশি, হুমকি প্রদান, জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও হয়রানি করার অভিযোগ পাওয়া যায়। আগষ্ট মাসে সেনাবাহিনীর ২০ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাক্টশন ব্যাটেলিয়ন কর্তৃক রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়িতে প্রায় ৬০ জুম্ম পরিবারের ভূমি, ঘরবাড়ি ও বাগান-বাগিচা ক্ষতি করে সীমান্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ করার ঘটনা ঘটে। পানছড়ি ও মাটিরাঙ্গা উপজেলায়ও সীমান্ত সড়ক নির্মাণের নামে জুম্মদের বাগান-বাগিচা ও স্থাপনা ধ্বংস করা হচ্ছে। আগষ্ট মাস থেকে রাঙ্গামাটির বিলাইছড়ির ফারুয়া ইউনিয়নে সেনাবাহিনীর বীর ৩২ রেজিমেন্ট কর্তৃক গাছ-বাঁশের ব্যবসা ও গ্রামের প্রথাগত ভূমিতে চাষাবাদ করতে বাধা দেয়া হয়েছে। আগষ্টের শেষান্তে সেনাবাহিনী রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন জুরাছড়ি উপজেলার আদিবাসী জুম্ম গ্রামবাসীদের নিকট হতে ব্যক্তিগত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করছে। এতে জনগণের মধ্যে যেমন উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি এভাবে জনগণের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করা সেনাবাহিনীর কাজ কিনা বা এর পেছনে সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যই বা কী তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

বাঘাইছড়িতে জুম্মদের ঘরবাড়ি, বাগান-বাগিচা ও বিভিন্ন স্থাপনা ধ্বংস করে নির্মাণাধীন সংযোগ সড়ক

গত ১১ অক্টোবর ২০২২ সকালের দিকে বরকল উপজেলাধীন সুবলং ইউনিয়নের বাঘাছোলা জ্ঞানোদয় বৌদ্ধ বিহারে বিভিন্ন এলাকার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনগণের অংশগ্রহণে কঠিন চীবর দানোৎসব চলাকালে রাঙ্গামাটি সেনা জোনের কম্যান্ডার লেঃ কর্নেল আতিকুর রহমান ও সুবলং সেনা সাব-জোনের কম্যান্ডার

ক্যাপ্টেন আওয়াল-এর নেতৃত্বে প্রায় ১২০ জনের একটি সেনাদল উক্ত বৌদ্ধ বিহারে আসে এবং বিহারটিকে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে বিহারের ভিতর ও বাইরে তল্লাসি চালায়। ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে সেনাবাহিনীর এমন মারমুখী আচরণে উপস্থিত পূণ্যার্থী জনগণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

গত ৩ অক্টোবর ২০২২ থেকে সেনাবাহিনী ও র‍্যাপিড একশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব) কর্তৃক রেইংখ্যং ভ্যালীর বিলাইছড়ি, রোয়াংছড়ি ও রুমা উপজেলাব্যাপী কম্বিং অপারেশন শুরু হয়। গোড়াতেই এই অভিযানের মূল টার্গেট ছিল রেইংখ্যং ভ্যালী অন্তর্গত তিন উপজেলার জুম্মদের গ্রাম এবং ব্যাপক জনপদ। কিন্তু ৬ অক্টোবর র‍্যাবের সংবাদ ব্রিফিং-এর মাধ্যমে বমপার্টি খ্যাত কেএনএফ নামক পাহাড়ি সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কর্তৃক 'জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়' নামক ইসলামী জঙ্গীদের প্রশিক্ষণ ও আশ্রয় প্রদানের তথ্য প্রকাশিত হলে অপারেশনের মোড় ইসলামী জঙ্গীদের বিরুদ্ধে ঘুড়ে দাঁড়ায়। ইসলামী জঙ্গীদের ধরতে রোয়াংছড়ির সিপ্পি (রামেত্তং) পাহাড়ে প্রতিষ্ঠিত বমপার্টি ও ইসলামী জঙ্গীদের মূল আস্তানা (সদর দফতর) সেনাবাহিনী ও র‍্যাব ঘিরে রাখলেও রহস্যজনকভাবে 'জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়' নামক সশস্ত্র ইসলামী জঙ্গী এবং জঙ্গীদের আশ্রয়দাতা কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ)-এর সভাপতি নাথান ও সামরিক শাখার প্রধান ভাঙচুংলিয়ান বম অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও শামীম মাহফুজসহ দলবল নিয়ে উক্ত আস্তানা থেকে পালিয়ে যায়। ২১ অক্টোবর ২০২২ এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে কেএনএফের ঘাঁটি থেকে জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়ার ৭ জন ও কেএনএফ-এর ৩ সদস্য সহ মোট ১০ জনকে আটক করেছে বলে র‍্যাব দাবি করে। তবে নিরাপত্তা বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর চার শতাধিক ক্যাম্পের মধ্যেও কেএনএফের আস্তানায় ইসলামী জঙ্গীদের ঘাঁটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সর্ষের মধ্যে ভূত রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

বিশেষ প্রতিবেদন

সেটেলারদের পার্বত্য চুক্তি বিরোধী তৎপরতা, ভূমি বেদখল ও নারীর উপর সহিংসতা

পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় রাষ্ট্রীয় পলিসি হচ্ছে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করা। স্বভাবতই জাতীয় পর্যায়ে মৌলবাদী ও ইসলামী জঙ্গী গোষ্ঠী সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় পলিসি যাই হোক না কেন পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামী রাজনৈতিক দল ও সংগঠন, ইসলামিক জঙ্গী গোষ্ঠী, উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলো প্রশাসন, রাষ্ট্রযন্ত্র ও সরকারের আনুকূল্যতা ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে থাকে। আর এক্ষেত্রে সেনাবাহিনী ও সেনা গোয়েন্দা সংস্থাই এসব বিভিন্ন দল, মত ও গোষ্ঠীগুলোকে ইসলামী সম্প্রসারণবাদী কার্যক্রমে সংগঠিত করে থাকে।

তার অন্যতম উদাহরণ হলো ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে সেনাবাহিনী ও সেনা গোয়েন্দা সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় পার্বত্য গণপরিষদ, পার্বত্য বাঙালি ছাত্র পরিষদ, বাঙালি ছাত্র ঐক্য পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলন ইত্যাদি মুসলিম সেটেলারদের উগ্র জাতীয়তাবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক কয়েকটি সংগঠনকে বিলুপ্ত করে একক সংগঠন হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ গঠন করা হয়।

জাতীয় পর্যায়ে অনেক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অহি-নকুল সম্পর্ক হলেও অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার রাষ্ট্রীয় পলিসি বাস্তবায়নে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর সঞ্চালনায় সেসব রাজনৈতিক দলগুলোকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে দেখা যায়। তারই প্রতিফলন দেখা যায় পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদে আওয়ামীলীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াত ও ছাত্র শিবিরের নেতা-কর্মীরা দল-মত নির্বিশেষে নাগরিক পরিষদে যুক্ত রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কাজী মজিবুর রহমান বান্দরবান জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক পার্বত্য জেলা পরিষদ সদস্য। পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদের আলিকদম উপজেলা শাখার সভাপতি মোঃ আবুল কালাম হচ্ছেন বিএনপির আলিকদম উপজেলা শাখার সভাপতি ও আলিকদম উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। ইসলামী ছাত্র শিবিরের বান্দরবান জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মিজানুর রহমান আখন্দ এখন পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদের নেতা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদের অঙ্গ সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি জেলা সভাপতি মোঃ নাজিম আল হাসান ইসলামী ছাত্র শিবির রাজনীতির সাথে যুক্ত। ছাত্র পরিষদের অধিকাংশ নেতাই শিবিরের সাথে সম্পৃক্ত। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র পরিষদের ব্যানারে তারা গোপনে শিবিরের প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদের খাগড়াছড়িজেলা কমিটির সহ প্রচার সম্পাদক পারভেজ আহম্মেদ শিবিরের রাজনীতির সাথে এবং

খাগড়াছড়ি জেলা কমিটিরসহ প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মোঃ ইব্রাহীম খলিল ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রবিউল হোসাইন জামায়াত ইসলামীর রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত বলে জানা গেছে।

মূলত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন তথা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং ভূমি বেদখল, জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা ও ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণে সংগঠিত করার লক্ষ্যেই সেনাবাহিনী ও ডিজিএফআই মুসলিম সেটেলার ও মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা ও মদদ দিয়ে চলেছে। তারই অংশ হিসেবে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর গঠিত হওয়ার সাথে সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ পার্বত্য ভূমি কমিশনের ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে আহূত বৈঠকের বিরুদ্ধে সড়ক অবরোধ করে। এরপর ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে আহূত ভূমি কমিশনের সভাও ঘেরাও অনুষ্ঠান করে এই মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। সর্বশেষ ৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ রাঙ্গামাটিতে আহূত ভূমি কমিশনের সভা প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে ৩২ ঘন্টা হরতাল পালন করে। এ সময়ে নাগরিক পরিষদের প্রতিবাদকারীদের প্রতিরোধ না করে আইন-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দা বাহিনী তাদের প্রতি প্রকারান্তরে সমর্থন ও মদদ দিতে প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল।

গত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুই বৌদ্ধ ভিক্ষু হামলার শিকার হয়, এদের মধ্যে ৩০ জানুয়ারি ২০২২ খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার গুগড়াছড়িতে বিশুদ্ধা মহাথের (৫২) নামে এক ভিক্ষু খাগড়াছড়িতে নৃশংসভাবে খুন হন। তার পরদিন ৩১ জানুয়ারি মুখোশ পরিহিত একদল দুর্বৃত্ত কর্তৃক চট্টগ্রাম নগরীর বায়োজীদ থানাস্থ জুম্ম চাদিগাং বৌদ্ধ বিহারে প্রবেশ করে জ্ঞানজ্যোতি ভিক্ষুকে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা চালানো হয়। মুসলিম সেটেলার বাঙালি ও ইসলামিক জঙ্গীগোষ্ঠী কর্তৃক এই হামলা সংঘটিত হয় বলে সন্দেহ করা হয়।

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ-মিয়ানমার আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নে সক্রিয় রোহিঙ্গা মুসলিম জঙ্গী সশস্ত্র গ্রুপ, আরসা ও আরএসও কর্তৃক ঘুমঘুম ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয় জুম্ম অধিবাসীদের উপর নানা ধরনের হয়রানি ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। যার ফলে সীমান্ত এলাকায় বসবাসরত জুম্ম অধিবাসীদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

নভেম্বর ২০২১ থেকে অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত এক বছরের মধ্যে মুসলিম বাঙালি সেটেলার ও ভূমিদস্যু কর্তৃক ভূমি জবরদখল, সাম্প্রদায়িক হামলা ও অগ্নিসংযোগ, মিথ্যা মামলা দায়ের, নারীর উপর সহিংসতা সংক্রান্ত ২৭টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ২৭টি ঘটনায় ২ জনকে হত্যা, ১১ জন নারীর উপর শারিরীক ও যৌন সহিংসতা, ২৫ জন গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে ২টি পৃথক মামলা দায়ের, জুম্মদের ৪৬টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লামায় ৩টি গ্রামের ৩৯টি পরিবারের ৩৫০ একর জমি বেদখলের শিকার, ৪টি সাম্প্রদায়িক হামলা ও ৪ জনকে আহত করার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

মাইসছড়িতে সেটেলার কর্তৃক জ্বালিয়ে দেয়া জুম্মদের ৩৭টি বাড়ির মধ্যে ভস্মিভূত একটি বাড়ি

১১ জন জুম্ম নারীর উপর সংঘটিত সহিংসতার মধ্যে সরকারি দল আওয়ামীলীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের ৫ জন নেতাকর্মী কর্তৃক এক জুম্ম কলেজ ছাত্রী সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা অন্যতম। অন্যদিকে বান্দরবান জেলার লামা থেকে সোলাইমান (২০) নামে এক যুবক কর্তৃক অপহৃত ১৭ বছরের এক আদিবাসী কিশোরীকে ৬ দিন পর ২৮ ডিসেম্বর বেনাপোল বাজার থেকে উদ্ধার করেছে বেনাপোল পোর্ট থানার পুলিশ।

সেটেম্বরে মাসে মোঃ রমজান ও মোঃ রাসেলসহ কয়েকজন সেটেলার খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার বর্মাছড়ি ইউনিয়ন্থ লাম্বাটিলায় সূচনা মায়া চাকমা (৩৮) নামে এক পাহাড়ি নারীকে হত্যার উদ্দেশ্যে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। ধর্ষণে বাধা দেয়ায় দুর্বৃত্তরা তাকে নৃশংসভাবে হত্যার চেষ্টা করেছে বলে জানা গেছে।

ভূমি বেদখল ও স্বভূমি থেকে জুম্মদেরকে উচ্ছেদের উদ্দেশ্য সংঘটিত ঘটনাগুলোর মধ্যে ৫ জুলাই ২০২২ দুই শতাধিক জন সেটেলার কর্তৃক খাগড়াছড়ির মহালছড়ির মাইসছড়িতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ছত্রছায়ায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের ৩৭টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও ভাঙচুর এবং দুইজন আহত হওয়ার ঘটনা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এ সময় পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলের পাশে উপস্থিত থাকলেও হামলাকারী সেটেলারদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

ভূমি বেদখলের উদ্দেশ্যে সেটেলার ও ভূমিদস্যু কর্তৃক সংঘটিত ঘটনাগুলোর আরেকটি বহুল আলোচিত ঘটনা হচ্ছে গত ২৬ এপ্রিল ২০২২ বান্দরবানের লামা উপজেলার সরই ইউনিয়নের লাংকম ম্রো কার্বারি পাড়া, জয়চন্দ্র ত্রিপুরা কার্বারি পাড়া এবং রেংয়েন ম্রো কার্বারি পাড়ার আদিবাসীদের ৩৫০ একর জুম ভূমি, ফলজবাগান ও গ্রামীণ বনে অগ্নিসংযোগের ঘটনা। লামার তিন গ্রামে জুম্মদের ৩৫০ একরের জুমভূমি, ফলজবাগান ও গ্রামীণ বনে অগ্নিসংযোগের ফলে ৩৯ পরিবারের ২০০ গ্রামবাসী জীবন-জীবিকা, খাদ্য ও পানীয় জলের সংকটের মুখে পড়ছে, অন্যদিকে বন্যপ্রাণীর মৃত্যুসহ প্রাকৃতিক প্রতিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

ভূমিদস্যু লামা রাবার ইন্ডাষ্ট্রিজের অপকর্ম এখানেই থেমে থাকেনি। ১৩ জুলাই লামা রাবার ইন্ডাষ্ট্রিজের কামাল উদ্দিন, মোয়াজ্জেম হোসেন, উহির উদ্দিনের গ্যাং ভূমি রক্ষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক, রংধজন ত্রিপুরা, ডলুছড়ি হেডম্যানের অফিসে হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে আক্রমণ করে। ১০ আগস্ট রাবার কোম্পানির ভাড়াটে লোকজন রেংয়েন ম্রো কার্বারি পাড়ার নবনির্মিত অশোক বৌদ্ধ বিহারে হামলা চালিয়ে লুটপাট ও ভাঙচুর চালায়। ১৪ আগস্ট ডেপুটি ম্যানেজার আব্দুল মালেক লামা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে লামা সরই ভূমি রক্ষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক রংধজন ত্রিপুরাসহ ১১ গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে সাজানো মামলা দায়ের করেন। ১ সেপ্টেম্বর ভূমিদস্যুরা লাংকম পাড়ায় ম্রোদের মিষ্টি কুমড়ার ক্ষেত থেকে ২৫ মণের অধিক মিষ্টি কুমড়া লুট করে।

লামা রাবার কোম্পানী কর্তৃক পুড়িয়ে দেয়া জুম্মদের জুমভূমি, ফলজবাগান ও গ্রামীণ বনের একাংশ

৪ সেপ্টেম্বর লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর ডেপুটি ম্যানেজার আব্দুল মালেক কর্তৃক ভূমি রক্ষার আন্দোলনে যুক্ত রংধজন ত্রিপুরা, লংকম ম্রোসহ ১৪ জন গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে নতুন আরেকটি মিথ্যা মামলা (সিআর মামলা নং-৩১৩/২০২২) দায়ের করা হয়। ৬ সেপ্টেম্বর রাবার কোম্পানির শ্রমিকরা রেংয়েন ম্রো কার্বারি পাড়াবাসীদের পানির উৎস কলাইয়া ঝিরিতে বিষ ঢেলে দিয়ে পাড়াবাসীদের হত্যার চেষ্টা চালায়। ২৪ সেপ্টেম্বর রাবার কোম্পানির লোকজন রেংয়েন ম্রো কার্বারি পাড়ার বাসিন্দা রেংইয়ুং ম্রোর প্রায় ৩০০ কলা গাছ কেটে দেয়।

২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ লামা থানার এসআই শামীম স্কুল নির্মাণ কাজে নিয়োজিত গ্রামবাসীদের নির্মাণ কাজ বন্ধ করতে নির্দেশ দেন। ২৭ সেপ্টেম্বর প্রশাসন ও পুলিশ উক্ত জায়গায় রাবার কোম্পানি ও গ্রামবাসীদের বিরোধের জের ধরে উভয় পক্ষকে প্রবেশে ১৪৪/৪৫ ধারা মোতাবেক নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও এবং হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা থাকলেও গত ২ অক্টোবর রাবার কোম্পানির লোকজন উক্ত স্থানে জঙ্গল কাটে। ২৩ অক্টোবর থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত সরই ইউনিয়নে লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজের লোকজন ম্রো গ্রামবাসীদের ৭০টি আমগাছ এবং আনুমানিক ২০ একর পরিমাণ গ্রামের বন কেটে দেয়।

এছাড়াও সম্প্রতি বান্দরবান পার্বত্য জেলার পার্শ্ববর্তী কক্সবাজার জেলাধীন উখিয়া উপজেলার মনখালী চাকমা পাড়ার আদিবাসী চাকমাদের উপর একদল মুসলিম বাঙালি ভূমিদস্যু হামলা চালিয়ে নারীসহ ৫ জনকে গুরুতর জখমসহ ২০ জনকে আহত করে।

হাইকোর্ট-প্রশাসনের নির্দেশনা উপেক্ষা করে ২৬ অক্টোবর জুম্মদের জুমভূমি-আমবাগান-বন কাটছে রাবার ইন্ডাষ্ট্রিজের লোকজন

বিশেষ প্রতিবেদন

প্রত্যাহৃত সেনা ক্যাম্পে এপিবিএন মোতায়েন পার্বত্য চুক্তির সরাসরি লঙ্ঘন
জিওসি ও আইজিপি কর্তৃক চুক্তি বিরোধী ও হুমকিমূলক বক্তব্য

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে পদদলিত করে প্রত্যাহৃত সেনা ক্যাম্পের জায়গায় একতরফাভাবে এপিবিএন ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ উদ্দেশ্যে গত ২৫ মে ২০২২ রাঙ্গামাটিতে উচ্চ পর্যায়ের আইন-শৃঙ্খলা সভা এবং ২৬ মে ২০২২ রাঙ্গামাটিতে এপিবিএনের আঞ্চলিক কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়েছে। উক্ত আইন-শৃঙ্খলা সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ সাংসদ ও সামরিক-বেসামরিক আমলাবৃন্দ এবং এপিবিএনের আঞ্চলিক কার্যালয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামের ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ও আইজিপি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী, উস্কানিমূলক ও হুমকিমূলক বক্তব্য প্রদান করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের ব্যর্থতাকে ধামাচাপা দেয়ার উদ্দেশ্যে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রাধান্য না দিয়ে কেবলমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, হানাহানির বিষয়টি ইস্যু করে বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে এবং পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনে লিপ্ত জুম্ম জনগণকে প্রচ্ছন্ন হুমকি প্রদান ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ ও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক দল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির স্বাক্ষরের পর বিগত ২৫ বছরেও এ চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে পার্বত্য সমস্যার কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক সমাধান হওয়া তো দূরের কথা, পার্বত্য সমস্যা আরো জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরকারী আওয়ামীলীগ সরকার গত ২০০৯ সাল থেকে ১৩ বছর ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছে। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়েও বর্তমান সরকার পার্বত্য চুক্তির মৌলিক বিষয়সহ অবাস্তবায়িত ধারাসমূহ বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেনি। চুক্তি বাস্তবায়নে নিজেদের ব্যর্থতাকে ধামাচাপা দিতে বর্তমান সরকার ১৩ বছর ধরে এই মর্মে অসত্য ও একতরফা তথ্য প্রচার করে আসছে যে, চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত ও ১৫টি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৯টি ধারার বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

পার্বত্য চুক্তির অন্যতম পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মতে পার্বত্য চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে মাত্র ২৫টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে। ১৮টি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট ২৯টি ধারা সম্পূর্ণভাবে অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে এবং সরকার এসব ধারা অব্যাহতভাবে লঙ্ঘন করে চলেছে। বিশেষ করে চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ হয় আংশিক বাস্তবায়ন হয়েছে নতুবা সম্পূর্ণ অবাস্তবায়িত অবস্থায় রেখে দেয়া হয়েছে।

ক. প্রত্যাহৃত ক্যাম্পের জায়গায় এপিবিএন ক্যাম্প স্থাপনে একতরফা সরকারি উদ্যোগ

১৩ এপ্রিল ২০২২ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার্স থেকে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির ৫ম বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের' দোহাই দিয়ে 'সেনাবাহিনীর প্রত্যাহারকৃত ২৪০টি ক্যাম্পে পর্যায়ক্রমে পুলিশ মোতায়েন করা হবে' মর্মে এক নির্দেশনা জারি করা হয়। 'প্রাথমিকভাবে ৩০টি ক্যাম্পে পুলিশ মোতায়েন করা হবে' বলে ঐ নির্দেশনায় উল্লেখ করা হয়। বস্তুত প্রত্যাহৃত সেনা ক্যাম্পের জায়গায় এপিবিএন ক্যাম্প স্থাপন করার উদ্যোগ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সরাসরি লঙ্ঘন।

পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খন্ডের ১৭(ক) ধারায় পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সীমান্তরক্ষী বাহিনী ব্যতীত সেনা, আনসার ও ভিডিপির সকল ক্যাম্প প্রত্যাহার করা এবং ১৭(খ) ধারায় সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করার বিধান করা হয়। কাজেই পার্বত্য চুক্তির এসব ধারা অনুযায়ী প্রত্যাহৃত ক্যাম্পের পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিক কিংবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরের পরিবর্তে এপিবিএন ক্যাম্প স্থাপন করা চুক্তির সাথে সম্পূর্ণভাবে বিরোধাত্মক ও সাংঘর্ষিক। উপরন্তু জনসংহতি সমিতির সাথে কোনোরূপ আলোচনা ও সম্মতি গ্রহণ ব্যতীত পার্বত্য চুক্তি লঙ্ঘন করে ২০০১ সালে সরকার একতরফাভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে সেনাশাসন জারি করে।

অপরদিকে পার্বত্য চুক্তির 'খ' খন্ডের ৩৪(খ)নং ধারায় 'পুলিশ (স্থানীয়)' বিষয়টি এবং ৩৩(ক)নং ধারায় 'জেলার আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন' সংক্রান্ত বিষয়টি তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরের বিধান করা হয়েছে এবং ২৪(ক) নং ধারায় 'পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন' মর্মে উল্লেখ রয়েছে।

২০১৮ সালের জানুয়ারিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে সাংসদ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহকে নিয়োগ দেয়ার পর এযাবত অনুষ্ঠিত পাঁচটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রথম চারটি সভায় পার্বত্য চুক্তির উক্ত বিধানাবলী অনুসারে নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে 'পুলিশ (স্থানীয়)' ও 'আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন' বিষয় হস্তান্তর করা ও অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা, পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন মোতাবেক পার্বত্য জেলা পুলিশ বাহিনী গঠন করার জন্য আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য, প্রত্যাহারকৃত অস্থায়ী ক্যাম্পের স্থলে পুলিশ ক্যাম্প বসানোর কোনো সিদ্ধান্ত চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটিতে গ্রহণ করা হয়নি।

কিন্তু পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির উল্লেখিত চারটি সভায় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করে সরকার কমিটির ৫ম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের যুক্তি দেখিয়ে এবং চুক্তির এ সংক্রান্ত বিধানাবলী পদদলিত করে প্রত্যাহৃত সেনা ক্যাম্পের জায়গায় এবিপিএন ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। এমনকি প্রত্যাহৃত সেনা ক্যাম্পের জায়গাগুলো প্রকৃত মালিকের নিকট কিংবা সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের হস্তান্তর না করে সেসব জায়গায় সেনাবাহিনী কর্তৃক 'নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য নির্ধারিত স্থান', 'উক্ত স্থানে কোনো প্রকার মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির, গির্জা, কেয়াং ঘর বা অন্য কোনো প্রকার স্থাপনা নির্মাণ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ও দন্ডনীয় অপরাধ' ইত্যাদি উল্লেখ করে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে এবং যেসমস্ত জায়গায় জুম্ম পরিবার বসবাস করছে সেসব পরিবারগুলোকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে হুমকি দেয়া হচ্ছে।

খ. আইন-শৃঙ্খলা সভা: চুক্তি বাস্তবায়নের পরিবর্তে দমন-পীড়নের হুমকি

২৫ মে ২০২২ সন্ধ্যায় রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রী পরিষদ সচিবের সঞ্চালনায় আইন-শৃঙ্খলা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রথমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সভা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদানের পর নিজ উদ্যোগে পার্বত্য মন্ত্রীসহ পার্বত্যাঞ্চলের জনপ্রতিনিধি, আইজিপি, জিওসি ও উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার বক্তব্য রাখেন। সভায় বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের ব্যর্থতাকে ধামাচাপা দিয়ে শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, সংঘাতের বিষয়টি ইস্যু করে হুমকিমূলক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বক্তব্য প্রদান করেন। সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিসহ চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে সোচ্চার জুম্ম জনগণকে সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সাথে লিপ্ত থাকার অভিযোগ তুলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার হুমকি প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে প্রত্যাহৃত সেনা ক্যাম্পের জায়গায় এপিবিএন ক্যাম্প স্থাপনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি'সহ সামরিক কর্মকর্তারা মূলত জুম্মদের রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, অপহরণ বিষয়ে একতরফা ও উদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পরিবর্তে সামরিক কর্মকর্তারা তাদের বক্তব্যে একপ্রকার দমন-পীড়নের হুমকি দিয়েছেন। পক্ষান্তরে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার বিশেষ প্রেক্ষাপটকে উপেক্ষা করে পার্বত্য মন্ত্রীসহ পার্বত্যাঞ্চলের সাংসদরাও সামরিক কর্মকর্তাদের মতো একদেশদর্শীভাবে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, হানাহানির কথা তুলে ধরেছেন।

বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা কোনো আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা নয়, এটি একটি রাজনৈতিক সমস্যা। কিন্তু সরকার পার্বত্য চুক্তির মূল স্পিরিট থেকে সরে এসে এখন উল্টো পথে হাঁটছে। ফলে এই রাজনৈতিক সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের উদ্যোগ না নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে আইন-শৃঙ্খলা সভা আয়োজন করে এবং উক্ত সভায় চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, হানাহানির ধোঁয়া তুলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করা হয়। এটা চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের ব্যর্থতা এবং জুম্মদের উপর সেনাবাহিনীর দমন-পীড়নকে জায়েজ করার একটা অপকৌশল বৈ কিছু নয় বলে বিবেচনা করা যায়।

গ. এপিবিএনের আঞ্চলিক কার্যালয় উদ্বোধন: জিওসি ও আইজিপির হুমকি ও চুক্তি বিরোধী বক্তব্য

২৬ মে ২০২২ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল রাঙ্গামাটিতে এপিবিএনের আঞ্চলিক অফিস উদ্বোধন করেন। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল সাইফুল আবেদীন ও আইজিপি ড. বেনজীর আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

জিওসি মেজর জেনারেল সাইফুল আবেদীন তার বক্তব্যে বলেছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে মাত্র ২টি ধারা ছিল জনসংহতি সমিতির পালনযোগ্য। কিন্তু পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খন্ডের ১৩নং ও ১৪নং ধারা অনুসারে জনসংহতি সমিতির তৎকালীন সদস্যরা সকল অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দেননি এবং সকল সশস্ত্র সদস্য সারেন্ডার করেননি বলে জিওসি অভিযোগ করেন। বস্তুত জিওসি'র উক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, মনগড়া ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এবং সরকারের চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনের সাথে বিরোধাত্মক।

কেননা চুক্তির ১২নং ধারা মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে জনসংহতি সমিতির সদস্যদের তালিকা, অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণী সরকারের নিকট জমা দিয়েছিল এবং ১৩নং ধারা মোতাবেক অস্ত্র জমাদানের দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করে অস্ত্র ও গোলাবারুদের জমাদান এবং জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গ স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের কাজ সম্পন্ন করে, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনেও সম্পূর্ণরূপে 'বাস্তবায়িত হয়েছে' বলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

জিওসি তার বক্তব্যে কেবল জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে মনগড়া ও ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে ধরেননি, তিনি চাঁদাবাজি ও সশস্ত্র তৎপরতার অভিযোগ এনে আন্দোলনরত জনসংহতি সমিতিকে সম্মুখ যুদ্ধের আহ্বান এবং ৩০ মিনিটের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করার হুমকি প্রদান; সেটেলার বাঙালিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসনের বিষয়টি আকাশ কুসুম কল্পনা হিসেবে আখ্যায়িত করে সাম্প্রদায়িক উস্কানী প্রদান; চুক্তিতে উল্লেখিত উপজাতীয় কোটা বাতিল করে তা 'পার্বত্য কোটা' নামকরণ করে মুসলিম বাঙালি সেটেলারদেরও সেই কোটায় অন্তর্ভুক্ত করা; চাকমাদের বিরুদ্ধে উপজাতীয় কোটা অপব্যবহারের অভিযোগ ইত্যাদি চুক্তি বিরোধী, সাম্প্রদায়িক উস্কানীমূলক ও হুমকিমূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

বিশেষ করে জিওসি সাইফুল আবেদীন তার বক্তব্যে বলেন যে, 'আপনারা যদি যুদ্ধ করতে চান আসুন যুদ্ধ করি। আপনারা এক হাজার, দুই হাজার, তিন হাজার লোককে আর কটা অস্ত্র নিয়ে আমাদের সাথে যদি যুদ্ধ করতে চান, আধাঘন্টাও টিকতে পারবেন না। আমরা সেনাবাহিনী, পুলিশ, আনসার, বিজিবি, যারা আছি তাদের সাথে আপনারা ৩০ মিনিট যুদ্ধ করেন। আসুন, যুদ্ধের জন্য আমরা জায়গা ঠিক করি।' বস্তুত জিওসি

সাইফুল আবেদীন আন্দোলনরত জুম্ম জনগণকে দেশে-বিদেশে সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, দুর্বৃত্ত হিসেবে ক্রিমিনালাইজ করার জন্য এভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান করেছিলেন। জিওসি সাহেব উগ্র বাঙালি জাত্যভিমানে ও পেশিশক্তিতে এতটাই হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি নিজ দেশের এক অংশের জনগণের বিরুদ্ধে একপ্রকার যুদ্ধ ঘোষণা করে ৩০ মিনিটের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন করার হুমকি দিয়েছিলেন, যা সরকারের উগ্র ফ্যাসীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকেই উন্মোচিত করেছে।

বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যাকে সমাধানের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু সরকার পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে সুকৌশলে ধামাচাপা দেয়ার হীনউদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের নামে মাঝে মাঝে আইন-শৃঙ্খলা সভা আয়োজন করে থাকে। এসব আইন-শৃঙ্খলা সভায় মন্ত্রী, ক্ষমতাসীন সাংসদ, নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তারা একতরফাভাবে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, হানাহানির কর্মকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ এনে জনসংহতি সমিতিসহ অধিকার আদায়ের আন্দোলনরত জুম্মদের বিরুদ্ধে হুমকি-ধমকি দিয়ে থাকে। এবারের আইন-শৃঙ্খলা সভায় জিওসি মেজর জেনারেল সাইফুল আবেদীন ও আইজিপি ড. বেনজির আহমেদের বক্তব্যও তার ব্যতিক্রম নয়। এভাবেই সরকার তথা রাষ্ট্রযন্ত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পরিবর্তে অধিকতর সংঘাতের দিকে ঠেলে দিয়ে চলেছে এবং এতদাঞ্চলের সার্বিক পরিস্থিতি আরো অধিকতর জটিল করে তুলছে।

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল বিষয় স্থানীয় সেনা ও গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। পার্বত্য চুক্তি-উত্তর সময়ে ২০০১ সালে জারিকৃত 'অপারেশন উত্তরণ'-এর বদৌলতে সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, বিচার ব্যবস্থা, উন্নয়নসহ গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। এমনকি সেনাবাহিনী তারা নিজেরা ইউপিডিএফ, সংস্কারপন্থী জেএসএস, ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক), মগপার্টি, বমপার্টি নামে সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সৃষ্টি করে তাদেরকে আশ্রয়-প্রশ্রয় এবং জসংহতি সমিতি ও চুক্তি সমর্থকদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাস ও সংঘাতের রাজত্ব কায়েম, সেটেলারদের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি ও ভূমি বেদখলসহ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে গণতান্ত্রিক শাসন এবং জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিত্বশীল আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর এইসব কার্যক্রম অন্যতম বাধা হিসেবে কাজ করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের পরিবর্তে বর্তমান সরকার পূর্ববর্তী স্বৈরশাসকদের মতো সামরিক উপায়ে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের নীতি অনুসরণ করে চলেছে। তদুদ্দেশ্যে কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যে ২০টির অধিক ক্যাম্প পুনঃস্থাপন করা হয়েছে এবং পূর্বের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে জুম্ম জনগণের উপর অভিযান চালানো হচ্ছে। জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকসহ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে সোচ্চার ব্যক্তি ও সংগঠনকে 'সন্ত্রাসী', 'চাঁদাবাজ', 'অস্ত্রধারী দুর্বৃত্ত' হিসেবে পরিচিহ্নিত করার জন্য ব্যাপক অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরকারী জনসংহতি সমিতিকে ধ্বংস করতে বর্তমান সরকার আজ উঠে পড়ে লেগেছে। জুম্ম জনগণের ঘরবাড়ি তল্লাসী, গ্রেফতার, ক্রশফায়ারের নামে বিচার-বহির্ভূত হত্যা, ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের, নারীর প্রতি সহিংসতা, অনুপ্রবেশ, ভূমি বেদখল, চুক্তি বিরোধী অপপ্রচার ইত্যাদি মানবতা ও জুম্ম স্বার্থ বিরোধী কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। সরকারের সেই হীনতৎপরতারই অংশ হিসেবেই এবিপিএন ক্যাম্প স্থাপন, তথাকথিত আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সভার আয়োজন ও সেই সভায় হুমকিমূলক বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

> 'পার্বত্য চট্টগ্রামের একটা ইতিহাস আছে এবং সেই ইতিহাসকে কেন এই সংবিধানে সংযোজিত করা হল না? যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার স্বীকৃত না হয়, তাহলে এই সংবিধান তাদের কি কাজে লাগবে।'
>
> *—মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রযন্ত্র-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপের তৎপরতা ও তথাকথিত 'ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত'

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা একটি রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যা। সুতরাং এর সমাধান রাজনৈতিকভাবেই করতে হবে। রাষ্ট্রযন্ত্র বরাবরই পাহাড়ের এই রাজনৈতিক সমস্যাকে অনুধাবন করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে এবং পূর্বের ন্যায় অব্যাহতভাবে সামরিকায়ন আর দমন-পীড়নের নীতি গ্রহণ করে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী একের পর এক সশস্ত্র গ্রুপ সৃষ্টি করে পাহাড়কে উত্তপ্ত করার ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে ভন্ডুল করা এবং জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন তথা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য রাষ্ট্রীয় বাহিনী, প্রশাসন ও স্থানীয় ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ জুম্মদের কতিপয় সুবিধাবাদী ও ক্ষমতালিপ্সু লোকদের নিয়ে একটির পর আরেকটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ সৃষ্টি করে চলেছে এবং বিভিন্ন কৌশলগত জায়গায় মোতায়েন করে তাদেরকে জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে চলেছে।

রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতা ও আশ্রয় প্রদানকারী সাম্প্রতিক সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ হচ্ছে কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ), যা বম পার্টি নামে সমধিক পরিচিত। ২০০৮ সালে কুকি-চিন ন্যাশনাল ডেভেলাপমেন্ট অর্গানাইজেশন (কেএনডিও) নামে নাথান বম ও ভাঙচুংলিয়ান বমের নেতৃত্বে গঠন করা হয়। ২০১৩ সালের ১০ই নভেম্বর রুমাতে এর অফিস উদ্বোধন করেন সেনাবাহিনীর তৎকালীন বান্দরবান ব্রিগেড কমান্ডার সায়েদ সিদ্দিকী। তৎপরবর্তী ২০১৫ সালের ২৮ জানুয়ারি তৎকালীন চট্টগ্রাম ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল সাব্বির আহমেদ কেএনডিও-এর অফিস পরিদর্শনে যান। পরে ২০১৬ সালে সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) রাখা হয় এবং তার সশস্ত্র শাখা হিসেবে কুকি-চিন ন্যাশনাল আর্মি (কেএনএ) গঠন করা হয়।

কেএনএফ গঠনের ক্ষেত্রে আগাগোড়াই রাষ্ট্রযন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। সেই সাথে ভারতের মনিপুর রাজ্যের কুকি ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন এবং মায়ানমারের কাচিন বিদ্রোহীদের মদদ ও পৃষ্ঠপোষকতাও রয়েছে বলে জানা যায়। ২০১৭ সালের দিকে কেএনএফের ৪২ জন সদস্য মায়ানমারের কাচিন প্রদেশে গিয়ে গেরিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বলে জানা যায়। তাদের মধ্যে ২ জন সদস্য কাচিন প্রদেশে মারা যায় এবং ১২/১৩ জন সদস্য কাচিন প্রদেশ থেকে পালিয়ে আসে। অবশিষ্ট সদস্য প্রশিক্ষণ শেষ করে ২০১৯ সালে বান্দরবানে ফিরে আসে বলে জানা যায়।

বমপার্টি খ্যাত কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের পেছনে শামীম মাহফুজের নেতৃত্বাধীন 'জামায়াত আরাকান' বা 'জামাতুল আনসার ফিল হিন্দা শারক্বীয়' (যার বাংলা অর্থ হচ্ছে 'পূর্ববর্তী হিন্দের সাহায্যকারী দল') নামে একটি ইসলামী জঙ্গীর পৃষ্ঠপোষকতাও রয়েছে বলে জানা গেছে। শামীম মাহফুজ এককালে জেএমবি ও হরকাতুল জিহাদের সক্রিয় সদস্য ছিলেন বলে জানা গেছে। কেএনএফ ও ইসলামী জঙ্গীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য ২০২০ সালে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় বলে জানা যায়। এই চুক্তি অনুসারে ইসলামী জঙ্গীদের জন্য কেএনএফ চীন-মায়ানমার সীমান্ত (চিন ও কাচিন প্রদেশ হয়ে) থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করবে এবং সংগৃহীত অস্ত্রের একটি নির্ধারিত অংশ কেএনএফ'কে প্রদান করবে ইসলামী জঙ্গীরা। অপরদিকে কেএনএফ কর্তৃক ইসলামী জঙ্গীদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে এবং তৎবিনিময়ে ইসলামী জঙ্গীরা কেএনএফ'কে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।

রুমার রেমাক্রি প্রাংসা ইউনিয়নের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কেএনএফের সশস্ত্র সদস্যদের সাথে একই আস্তানায় অবস্থান করতো সশস্ত্র ইসলামী জঙ্গীরা। এরপর তারা রোয়াংছড়ি উপজেলার রনিন পাড়া সংলগ্ন সিপ্পি বা রামেত্তং পাহাড়ে অবস্থান নিয়েছিল। সম্প্রতি অক্টোবর মাসে ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে র‍্যাব কর্তৃক গ্রেফতারকৃত ১২ জন ইসলামী জঙ্গী সদস্যরাও কেএনএফের ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নেয়ার কথা স্বীকার করে। এরপর সেনাবাহিনী ও র‍্যাব রোয়াংছড়ির রনিন পাড়া সংলগ্ন সিপ্পি বা রামেত্তং পাহাড়ে অবস্থিত কেএনএফ ও ইসলামী জঙ্গীদের আস্তানা ঘেরাও করে। কিন্তু রহস্যজনকভাবে সেনাবাহিনী ও র‍্যাবের ঘেরাও থেকে কেএনএফের সভাপতি নাথান বম ও সামরিক প্রধান ভাঙচুংলিয়ান বম শামীম মাহফুজসহ ইসলামী জঙ্গীদের নিয়ে নিরাপদে অন্যত্র পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় বলে জানা গেছে। বাহ্যত টানা আড়াই সপ্তাহব্যাপী অপারেশনের পর বমপার্টির ক্যাম্প থেকে ৭ জন ইসলামী জঙ্গী ও ৩ জন বমপার্টির সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে মর্মে র‍্যাব গত ২১ অক্টোবর ২০২২ এক সম্মেলনে উপস্থাপন করে। তবে স্থানীয় অনেকের অভিমত যে, বমপার্টির সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের সাথে গহীন জঙ্গলে ইসলামী জঙ্গীরা বহাল তবিয়তে রয়েছে। যে ৭ জন জঙ্গীকে র‍্যাব গ্রেফতার করেছে মর্মে দাবি করা হচ্ছে, তাদেরকে অন্য জেলায় গ্রেফতার করে পার্বত্য চট্টগ্রামে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

বস্তুত কেএনএফ বান্দরবান এবং রাঙামাটি জেলার ৯টি উপজেলাকে নিয়ে স্বতন্ত্র 'কুকি-চিন রাজ্য', কখনো বা 'খ্রীষ্টান রাজ্য' প্রতিষ্ঠার কথা বলে জনগণকে বোকা বানানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে। একই সাথে তারা আবার এটাও প্রকাশ্যে স্বীকার করে যে, তারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে কোনো প্রকার সংঘর্ষে যাবে না। এমনকি সেনাবাহিনীকে তাদের 'অভিভাবক' ও 'এজেন্ডা' বলেও কেএনএফ তাদের ফেইসবুকে উল্লেখ করেছে।

প্রতিষ্ঠার পরপরই কেএনএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা জনসংহতি সমিতিকে নিজেদের শত্রু বলে চিহ্নিত করেছে এবং ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে 'চাকমা চুক্তি' ও চুক্তির ধারা বলে গঠিত আঞ্চলিক পরিষদকে 'চাকমা পরিষদ', এমনকি জনসংহতি সমিতিকে 'চাকমা দল' নামে অভিহিত করে জাতি বিদ্বেষী নানা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। একইভাবে পাহাড়ের সংখ্যাগুরু আদিবাসী জনগোষ্ঠী (চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা) এবং সংখ্যাল্প আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদের দেওয়াল সৃষ্টি করার জন্য নানা ধরনের ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে।

কেএনএফ সশস্ত্র গোষ্ঠীটি বিভিন্ন প্রচারণায় পাহাড়ি-বাঙালি সমঅধিকারের বুলি আওড়িয়ে থাকে, বহিরাগত সেটেলারদেকে পাহাড়ে বৈধতা দিয়ে থাকে, এমনকি তাদের অঙ্কিত মানচিত্রে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলাকে সম্পূর্ণ 'রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকা' বলে চিহ্নিত করে থাকে। অথচ ঐতিহাসিক কাল থেকে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় চাক, মারমা, রাখাইন এবং ম্রোদের বসবাস। এই সশস্ত্র গোষ্ঠীটি বম, লুসাই, খিয়াং, খুমি, পাংখো ও ম্রো জনগোষ্ঠীগুলোকে কুকি-চিন জনগোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের উন্নয়ন ও অধিকারের কথা বললেও নিরাপত্তা বাহিনী এবং রাষ্ট্রযন্ত্র মদদপুষ্ট বিভিন্ন কোম্পানী ও ভূমিদস্যু কর্তৃক ক্যাম্প স্থাপন, পর্যটন, ইজারা, হর্টিকালচার ইত্যাদি নামে এসব জনগোষ্ঠীর চিরায়ত ভূমি কেড়ে নেয়ার বিরুদ্ধে একেবারেই নীরবতা পালন করে কার্যত মৌন সমর্থন দিয়ে চলেছে।

বমপার্টি সন্ত্রাসী কর্তৃক তঞ্চঙ্গ্যা ও ত্রিপুরা গ্রামবাসীদের উচ্ছেদের ফলে পলায়নরত গ্রামবাসী

কেএনএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক সংঘটিত ঘটনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে নৃশংস ঘটনা হচ্ছে গত ২১ জুন ২০২২ কোনো কারণ ছাড়াই একেবারে ঠান্ডা মাথায় বিলাইছড়ির বড়থলি ইউনিয়নের সাইজাম পাড়ায় ৫টি ত্রিপুরা পরিবারের উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে তিনজন নিরীহ ত্রিপুরা গ্রামবাসীকে হত্যা ও দুই শিশুকে গুলিবিদ্ধ করার ঘটনা। এতে তিন পার্বত্য জেলাসহ সারাদেশে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এরপর ২৯ জুন ২০২২ থেকে বিলাইছড়ির বড়থলি ইউনিয়ন এবং রোয়াংছড়ির আলেক্ষ্যং ইউনিয়ন থেকে শতাধিক তঞ্চঙ্গ্যা ও ত্রিপুরা গ্রামবাসীদেরকে উচ্ছেদ করে সন্ত্রাসীরা। কেএনএফের এই নৃশংসতার বিষয়ে প্রশাসনের কাছে তুলে ধরা হলেও প্রশাসনের তরফ থেকে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এমনকি এই ঘটনাকেই ধামাচাপা দিতে চেয়েছিল রাষ্ট্রীয় বাহিনী। ঘটনার শিকার গ্রামবাসীরা রুমা সেনা জোনে সম্পূর্ণ ঘটনাটি খুলে বলার পরেও সেনাবাহিনী সেটিকে 'বিশ্বাসযোগ্য নয়' বলে উড়িয়ে দিয়েছিল।

সাইজাম পাড়ায় গুলি করে বমপার্টি কর্তৃক তিনজন ত্রিপুরা গ্রামবাসীকে খুন ও দুই শিশুকে আহত করার ঘটনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

বমপার্টি সন্ত্রাসীদের গুলিতে আহত শিশু ও তার মা।

রাষ্ট্রীয় বাহিনী ও ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতৃত্ব আরেকটি সশস্ত্র গ্রুপ সৃষ্টি করে ও মদদ প্রদান করে, সেটি হচ্ছে মারমা লিবারেশন পার্টি, যা মগ পার্টি নামে পরিচিতি লাভ করে। উল্লেখ্য, আরাকান লিবারেশন পার্টি (এএলপি) মায়ানমারের রাখাইন (আরাকান) প্রদেশের একটি সশস্ত্র

বিদ্রোহী দল। ২০১৫ সালে গণতন্ত্রপন্থী অং সান সুচির নেতৃত্বে ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি মায়ানমারের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে আরাকানের সমস্যা রাজনৈতিকভাবে সমাধানের উদ্দেশ্যে সরকারের সাথে যুদ্ধ বিরতিতে অবতীর্ণ হয় এএলপি। তখন দলটির সাধারণ সম্পাদকসহ অধিকাংশ নেতা-কর্মী আরাকানে চলে যান। ঐ সময়ে এএলপি সদস্যদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশ (১৪-১৭ জনের মতো) মায়ানমারে পাড়ি না দিয়ে মিজোরামে থেকে যায়। পরে তাদের পরিবারে খাবারসহ বিভিন্ন অভাব দেখা দিলে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বান্দরবান জেলার থানচির বলিপাড়া এলাকায় অস্ত্রশস্ত্রসহ চলে আসে এবং পাড়াবাসী ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক চাঁদাবাজি শুরু করে। পরবর্তীতে এএলপির দলছুট গ্রুপে স্থানীয় মারমা জনগোষ্ঠীর লোক ভর্তি করানো হয় এবং মারমা (মগ) জনগোষ্ঠীর সহজে সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে সেনাবাহিনী ও ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতৃত্বের ইন্ধনে এএলপি থেকে মারমা লিবারেশন পার্টি (এমএনপি) নাম রাখা হয়, যারা এক পর্যায়ে মগপার্টি নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করে।

পরবর্তী সময়ে ২০১৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় বাহিনী ও স্থানীয় আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতৃত্ব কর্তৃক মগ পার্টির সশস্ত্র সন্ত্রাসীদেরকে রাজস্থলী উপজেলার গাইন্দ্যা ইউনিয়নের গব ও পোয়াইতু পাড়া এলাকায় এনে মোতায়েন করা হয়। তখন থেকেই পোয়াইতু পাড়ায় আশ্রয় দিয়ে মগ পার্টি সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা রাঙ্গামাটির রাজস্থলী ও কাপ্তাই এবং বান্দরবানের সদর ও রোয়াংছড়ি উপজেলায় জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকদেরকে হত্যা, অপহরণ ও সন্ত্রাস চালিয়ে যেতে থাকে। নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক মগপার্টিকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দানের সর্বশেষ উলঙ্গ ঘটনা হচ্ছে গোয়েন্দা সংস্থার তিনজন লোকের নিরাপত্তার আশ্রয়ে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে মগপার্টির ২৫ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসীদেরকে বান্দরবান শহরের উজানীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রাতযাপনের ব্যবস্থা করা এবং তার পরদিন শহরের বড়ুয়া টেকের মধ্য দিয়ে তামব্রু এলাকায় নিয়ে যাওয়ার ঘটনা। প্রতিপক্ষ গ্রুপের একের পর এক আক্রমণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় মগপার্টি সদস্যদের মনোবল একেবারেই ভেঙ্গে গেছে বলে জানা গেছে। তারা এখন রাষ্ট্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় কতিপয় জায়গায় অবস্থান করছে।

২০০৭-২০০৮ সালে দেশে জরুরী অবস্থা চলাকালে সেনাবাহিনী কর্তৃক রাজনৈতিক সংস্কারের ধোঁয়া তুলে জাতীয় পর্যায়ে 'টু মাইনাস থিয়োরী'র আলোকে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে মাইনাস করার ষড়যন্ত্র চালানো হয়। অনুরূপভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামেও 'মাইনাস সন্তু লারমা' থিয়োরীর মাধ্যমে সেনাবাহিনী জনসংহতি সমিতির কতিপয় সুবিধাবাদী ও ক্ষমতালিপ্সু নেতৃবৃন্দকে জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্তু লারমার বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালে নিরাপত্তা বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় রূপায়ণ দেওয়ান, চন্দ্র শেখর চাকমা, সুধাসিন্ধু খীসা ও তাতিন্দ্র লাল চাকমার নেতৃত্বে কতিপয় সুবিধাবাদী ও ক্ষমতালিপ্সু নেতৃবৃন্দ কর্তৃক জেএসএস (এম এন লারমা) নাম দিয়ে আরেকটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সৃষ্টি করা হয়, যেটি 'সংস্কারপন্থী' হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করে। শাসকশ্রেণির মদদে ইউপিডিএফের সাথে যৌথভাবে এই সংস্কারপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠী জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে অপপ্রচার এবং সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের উপর খুন-হামলা এবং অবাধে চাঁদাবাজি ও মুক্তিপণ আদায় করতে থাকে। ২০২০ সালের জুন মাসে সুধাসিন্ধু খীসা এবং এরপর আগষ্ট মাসে তাতিন্দ্র লাল চাকমার মৃত্যু হলে সংস্কারপন্থী জেএসএস দুর্বল হয়ে পড়ে। সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় মহালছড়ি উপজেলাকে কেন্দ্র করে প্রজ্ঞান চাকমার নেতৃত্বে সংস্কারপন্থীদের একটি ফ্যাকশনের সশস্ত্র তৎপরতা এখনো অব্যাহত রয়েছে। আর কিছু সশস্ত্র সদস্য ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) নামক আরেকটি সশস্ত্র গ্রুপে যোগদান করে।

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, সংস্কারপন্থী নেতা তাতিন্দ্র লাল চাকমার মদদে ইউপিডিএফের দলছুট ও বহিস্কৃত সদস্যদের নিয়ে ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে তপন জ্যোতি চাকমা বর্মা ও শ্যামল কান্তি চাকমা তরু-এর নেতৃত্বে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) নামে আরেকটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সৃষ্টি করা হয়। ২০১৮ সালের মে মাসে ইউপিডিএফের প্রতিশোধমূলক হামলায় তপন জ্যোতি চাকমা বর্মা নিহত হলে শ্যামল কান্তি চাকমা এই গ্রুপের নেতৃত্বে চলে আসেন। মূলত প্রসিত নেতৃত্বাধীন ইউপিডিএফের নেতৃত্বকে বিরোধিতা করে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক)-এর জন্ম হলেও একপর্যায়ে রাষ্ট্রীয় বাহিনী তাদেরকে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব এবং জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে চলমান আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে থাকে। বর্তমানে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সশস্ত্র সদস্যদেরকে রাঙ্গামাটির সুবলং ও জীবতলী ইউনিয়নে, বান্দরবান শহরে এবং খাগড়াছড়ির পানছড়ি ও দীঘিনালায় মোতায়েন করে জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে নিয়োজিত রাখা হয়েছে, তবে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সশস্ত্র গ্রুপও অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। এখন শহর এলাকার কিছু কিছু স্থানে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর আশ্রয়ে তাদের অবস্থান রয়েছে মাত্র।

এ ধরনের সশস্ত্র গ্রুপ হিসেবে প্রথমে আশ্রয়-প্রশ্রয় ও মদদ দেয়া হয় পার্বত্য চুক্তির অব্যবহিত পরে ১৯৯৮ সালের শেষান্তে গঠিত প্রসিত-রবিশংকরের নেতৃত্বাধীন চুক্তি-বিরোধী ইউপিডিএফকে। পার্বত্য চুক্তিকে বিরোধিতা করে এবং তথাকথিত পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন আদায়ের লক্ষ্যে ইউপিডিএফ গঠিত হয়েছে বলে দাবি করা হলেও বস্তুত রাষ্ট্রীয় বাহিনীর

ছত্রছায়ায় অবাধে চাঁদাবাজি, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় এবং জনসংহতি সমিতির একের পর এক সদস্য ও সমর্থককে হত্যা করা ছাড়া তথাকথিত পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন আদায়ের লক্ষ্যে ইউপিডিএফ'কে কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। বরঞ্চ গঠিত হওয়ার পর পরই ইউপিডিএফ'কে সেনা ক্যাম্পের সন্নিকটে আশ্রয় প্রদান করে রাষ্ট্রীয় বাহিনী তাদেরকে অবাধে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাতে মদদ দিতে থাকে। একসময় খাগড়াছড়ি সংসদীয় আসনের বিএনপি'র এমপি ও উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলন'-এর প্রতিষ্ঠাতা আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াসহ উগ্র জাতীয়তাবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সাথে প্রসিত বিকাশ খীসার দহরম-মহরমের ঘটনা শাসকশ্রেণির সাথে ইউপিডিএফের সম্পৃক্ততার প্রতীয়মান হয়।

সংস্কারপন্থী খ্যাত জেএসএস (এম এন লারমা) নামে আরেকটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সৃষ্টি করা হলে রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক ইউপিডিএফ'কে প্রশ্রয় ও মদদ দানের ধারা কিছুটা শ্লথ হয়ে পড়ে। তবে দীর্ঘদিনের অব্যাহত চেষ্টার ফলে ইউপিডিএফ সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সাথে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। ২০২১ সালের প্রথম দিকে খাগড়াছড়ি সদরে এবং পানছড়ির ভাইবোনছড়া এলাকায় সেনাবাহিনীর সাথে সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যে ইউপিডিএফ নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে একাধিক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। তার মধ্যে ২৭ এপ্রিল ২০২১ উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা ও সচিব চাকমা'র নেতৃত্বে ইউপিডিএফ-এর একটি প্রতিনিধিদল খাগড়াছড়ি সদরে এ ধরনের একটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ৯ জুন ২০২২ সরকারের নিকট পেশ করার জন্য মধ্যস্থতাকারী সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর এমদাদুল ইসলামের কাছে ইউপিডিএফের কেন্দ্রীয় সদস্য উজ্জল স্মৃতি চাকমা দাবিনামা পেশ করেন।

তথাকথিত এই দাবিনামা পেশ করার পর পরই ১১ জুন ২০২২ ইউপিডিএফের সশস্ত্র সদস্যরা জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের উপর সশস্ত্র হামলা শুরু করে। এভাবেই এখন রাষ্ট্রীয় বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় ও মদদে জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে ইউপিডিএফের সশস্ত্র তৎপরতা অধিকতর পরিমাণে জোরদার করেছে। পক্ষান্তরে এর দায় জনসংহতি সমিতির উপর চাপানোর জন্য তথাকথিত 'ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত' বন্ধের দাবিতে জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে মিটিং-মিছিল আয়োজন করতে সাধারণ নিরীহ নিরস্ত্র গ্রামবাসীদেরকে বাধ্য করে চলেছে।

সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের নিপীড়ন-নির্যাতন

২০২১ সালের নভেম্বর থেকে ২০২২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এক বছরের মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনী ও স্থানীয় আওয়ামীলীগ মদদপুষ্ট মগপার্টি খ্যাত এমএনপি, বমপার্টি খ্যাত কেএনএফ, ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক), সংস্কারপন্থী জেএসএস ও প্রসিত সমর্থিত ইউপিডিএফ ইত্যাদি সন্ত্রাসী দল কর্তৃক ৭৯টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়েছে। তার মধ্যে ২৪ জনকে খুন, ৪৮ জনকে অপহরণ, ৩৩ জনকে হুমকি ও মারধর, অপহৃত ২ জনকে মিথ্যা মামলায় পুলিশের নিকট সোপর্দ, এবং ১৩ জন ইউপি মেম্বার-চেয়ারম্যানের কাছ থেকে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করার ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনার সবচেয়ে জঘন্য ছিল বমপার্টি নামে খ্যাত কুকি-চীন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) সন্ত্রাসী কর্তৃক বিলাইছড়ির বড়থলিতে একটি ত্রিপুরা পাড়ায় এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে নিরীহ ৩ জন গ্রামবাসীকে হত্যা ও ২ শিশুকে গুরুতর জখম করা এবং তার পরবর্তীতে বড়থলি ও রোয়াংছড়ির আলেক্ষ্যং ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ অঞ্চল থেকেতঞ্চঙ্গ্যা ও ত্রিপুরাদের ১০০-এর অধিক জুমচাষী পরিবারকে উচ্ছেদ করা।

৬ জন খুনের শিকার ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম হলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সদস্য এবং বান্দরবান সদর থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক পুশৈথোয়াই মারমা (৪২)। বান্দরবান সদর উপজেলাধীন চিমি ডুলুপাড়া থেকে মগ পার্টির সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ১২ ডিসেম্বর ২০২১ তাকে নিজ বাড়ি থেকে অপহরণের পর গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

এছাড়া ১৩ ডিসেম্বর রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলার অন্তর্গত বাঙ্গালহালিয়া থেকে ধর্মচরন তঞ্চঙ্গ্যাকে অপহরণ করে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেয়। পরে সেনাবহিনী সদস্যরা একটি এক নলা দেশীয় বন্দুক ও ৪ রাউন্ড কার্তুজ গুঁজে দিয়ে পুলিশের নিকট সোপর্দ করে।

২০২১ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে বিভিন্ন সময়ে সেনা-আওয়মীলীগ মদদপুষ্ট মগপার্টি সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা অপরহণ করে কিংবা ফোনে মৃত্যুর হুমকি দিয়ে রাজস্থলী ও কাপ্তাই এলাকার ১৪ জন ব্যক্তি থেকে মোট ১.১৫ কোটি টাকা চাঁদা ও মুক্তিপণ হিসেবে আদায় করে। কাপ্তাই জোনে নিয়োজিত ২৩ বেঙ্গল রেজিমেন্টের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে মগপার্টি সন্ত্রাসীরা এসব চাঁদাবাজি ও মুক্তিপণ আদায় করেছিল।

তথাকথিত 'ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত'

১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর চুক্তি বিরোধিতার নামে ও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন আদায়ের ধোঁয়া তুলে জুম্ম জনগণের মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত ঘটায় ইউপিডিএফ। পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে না হতেই ইউপিডিএফ 'চুক্তিকে কালো চুক্তি' আখ্যায়িত করে 'জুম্ম জনগণের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে জনসংহতি সমিতি চুক্তি করেছে', 'জুম্ম জনগণের সাথে জনসংহতি সমিতি চরম বেঈমানী করেছে', 'জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের প্রধান শত্রু হলো জনসংহতি সমিতি' ইত্যাদি আওয়াজ তুলে রাষ্ট্রযন্ত্রের ছত্রছায়ায় অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানে গমনকারী জনসংহতি সমিতির সদস্যদের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ, কালো পতাকা প্রদর্শন, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে থাকে। একপর্যায়ে জনসংহতি সমিতির নেতা-কর্মীরা স্ব স্ব এলাকায় গিয়ে স্বাভাবিক জীবন-যাপন শুরু করলে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর মদদে তাদের উপর একের পর এক সশস্ত্র হামলা শুরু করে। জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের উপর হত্যা, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় ইত্যাদি সংঘটিত করে পার্বত্য চট্টগ্রামে এক অরাজক পরিস্থিতির জন্ম দিয়ে থাকে ইউপিডিএফ।

'ভাগ করো শাসন করো' ঔপনিবেশিক নীতির অংশ হিসেবে শাসকশ্রেণি ইউপিডিএফের মতো একে একে সংস্কারপন্থী জেএসএস, ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক), মগপার্টি খ্যাত এমএনপি, বমপার্টি খ্যাত কেএনএফ ইত্যাদি সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ সৃষ্টি করেছে এবং সেসব সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপের মাধ্যমে জনসংহতি সমিতির সদস্য ও চুক্তি সমর্থক পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের উপর সন্ত্রাস ও সংঘাত চাপিয়ে দিয়ে চলেছে। অথচ ইউপিডিএফ-এর পাশাপাশি সরকারের বিশেষ মহল সেই সংঘাতকে 'ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত' হিসেবে আখ্যায়িত করে জুম্ম জনগণের সহানুভূতি অর্জনের অপচেষ্টা চালিয়ে আসছে এবং দেশী-বিদেশী চক্রান্তের খপ্পড়ে পড়ে জনমতকে বিভ্রান্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। শুধু তাই নয়, ইউপিডিএফ বড় গলায় ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বিরোধী মিছিল ও সমাবেশ করতে নিরস্ত্র নিরীহ লোকজনদেরকে বাধ্য করে চলেছে এবং জনসংহতি সমিতির উপর সেই তথাকথিত ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতের দায় চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চালিয়ে আসছে।

বস্তুত প্রসিত সমর্থিত ইউপিডিএফ, সংস্কারপন্থী জেএসএস, ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক), মগপার্টি, বমপার্টি হচ্ছে শাসকগোষ্ঠীর মদদপুষ্ট এক একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ এবং রাষ্ট্রীয় বাহিনীর এক একটি লাঠিয়াল বাহিনী বৈ কিছু নয়। জুম্ম জনগণের আন্দোলনের বিরুদ্ধে এসব সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ শাসকগোষ্ঠীর পঞ্চম বাহিনী হিসেবে ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং এসব সশস্ত্র গ্রুপগুলোকে লেলিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রীয় বাহিনী আজ জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের চলমান পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রক্সি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এসব সশস্ত্র গ্রুপগুলো আজ শাসকশ্রেণির প্রক্সি বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। তাই জুম্ম জনগণের উপর চলমান এই সংঘাত কখনোই ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। এই সংঘাত জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে শাসকগোষ্ঠীর লেলিয়ে দেয়া সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সন্ত্রাস বৈ কিছু নয়।

বিশ্বের দেশে দেশে যে কোনো জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে প্রসিত সমর্থিত ইউপিডিএফ, সংস্কারপন্থী জেএসএস, ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক), মগপার্টি ও বমপার্টির মতো প্রতিবিপ্লবী গোষ্ঠীগুলো যেমনি কখনোই মুক্তি সংগ্রামরত জাতীয়তাবাদী দলের সাথে একাত্মতায় আসতে পারেনি, তেমনি জনসংহতি সমিতির আহ্বানেও এসব প্রতিবিপ্লবী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোও শাসকগোষ্ঠীর উস্কে দেয়া চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম থেকে সরে আসেনি। অতীতে সত্তর দশকে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে জুম্ম জনগণ যেভাবে যুবসংঘ, ট্রাইবাল পিপলস পার্টি, সর্বহারা পার্টি, বামেঞাতা প্রভৃতি প্রতিবিপ্লবী ও অতিবিপ্লবী গ্রুপগুলোকে মোকাবেলা করেছে, তেমনি ইউপিডিএফ, সংস্কারপন্থী জেএসএস, ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক), মগপার্টি ও বমপার্টির মতো প্রতিবিপ্লবী গোষ্ঠীগুলোকে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে মোকাবেলার জন্য দেশপ্রেমিক ও মুক্তিকামী জুম্ম জনগণকেও অধিকতর জোরালো ভূমিকা গ্রহণ করতেই হবে।

> '...সবচেয়ে দুঃখজনক কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের মা-বোনদের কথা এখানে নাই। নারীর যে অধিকার সেটা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। নারীকে যদি অধিকার দিতে হয়, তাহলে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে, সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে।'
>
> *– মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, (২৫ অক্টোবর ১৯৭২ সংবিধান বিলের উপর আলোচনা)*

বিশেষ প্রতিবেদন

জাতিগত নির্মূলীকরণে সরকারের ডেভেলাপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং

সরকার সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্র কাজে লাগিয়ে চারিদিকে ঘিরে ধরার মাধ্যমে জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের নীলনক্সা বাস্তবায়ন করে চলেছে। তারই অংশ হিসেবে উন্নয়ন ক্ষেত্রকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে জুম্মদেরকে তাদের চিরায়ত জায়গা-জমি থেকে উচ্ছেদ, অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেয়া, এলাকার জীব-বৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করে চলেছে। এসব উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রিজার্ভ ফরেষ্ট ঘোষণা, অস্থানীয়দের নিকট জুম্মদের প্রথাগত জুম ভূমি ও মৌজা ভূমি লিজ দেয়া, বিলাসবহুল পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন, সীমান্ত সড়ক ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ, নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণ, পার্বত্য চট্টগ্রামে গ্যাস-তেল অনুসন্ধান ইত্যাদি অন্যতম।

এ ধরনের একটি প্রকল্প হচ্ছে আশি-নব্বই দশকে রাবার প্লান্টেশন, বন বাগান, ফলবাগানসহ হর্টিকালচারের নামে বান্দরবান পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নয় এমন ব্যক্তির নিকট প্রদত্ত ৪০ বছর মেয়াদী ভূমি লীজ। বান্দরবান সদর, লামা, আলিকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় সমতল জেলার (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগ) অধিবাসীদের নিকট সর্বমোট ১৬০৫টি রাবার প্লট ও হর্টিকালচার প্লট-এর বিপরীতে প্লট প্রতি পঁচিশ একর করে ৪০,০৭৭ একর জমি ইজারা দেওয়া হয়েছে। লীজ গ্রহণকারীদের মধ্যে সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা ও তাদের আত্মীয়-স্বজন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, নানা প্রভাবশালী গোষ্ঠী রয়েছে। লীজ প্রদত্ত ভূমির মধ্যে রয়েছে আদিবাসী জুমচাষীদের প্রথাগত জুমভূমি। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে জুম্মদের রেকর্ডীয় ও ভোগদলীয় ভূমিও রয়েছে। এর ফলে শত শত জুম্ম অধিবাসী তাদের জুম ক্ষেত্র হারিয়ে ফেলছে এবং নিজ বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে।

এ ধরনের অন্যতম প্রকল্পের উদাহরণ হচ্ছে লামা উপজেলার সরই ইউনিয়নে ৬৪ জন সামরিক-বেসামরিক আমলা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিকট প্রদত্ত লিজ, যারা লামা রাবার ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড নামে একটি রাবার কোম্পানী গঠন করেছে। লামা রাবার ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেডের মালিকদের মধ্যে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান এস এম আল হোসেনী, সাবেক মুখ্য সচিব কে এম রাব্বানী, সাবেক সচিব কামাল উদ্দিন, ডা: মোহাম্মদ ফরিদের স্ত্রী, কে এম রাব্বানীর ছোট ভাই ক্যাপ্টেন (অবঃ) হাবিবী রাব্বানী, রূপালী ব্যাংকের সাবেক এমডি রফিকুল করিম এবং তার পরিবারের চারজনসহ মোট ৬৪ জন সামরিক ও বেসামরিক আমলা এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরা হয়েছেন।

৬৪ জন ইজারাদারকে প্রতি প্লটে ২৫ একর করে ৬৪টি প্লটে ১,৬০০ একর জমি লিজ দেয়া হয়েছে। কিন্তু লামা রাবার কোম্পানী রাষ্ট্রীয় বাহিনী ও প্রশাসনের ছত্রছায়ায় ১,৬০০ একরের স্থলে তিনটি জুম্ম গ্রামের জুম ভূমি, মৌজা ভূমিও গ্রামীন বনসহ প্রায় ৩,৫০০ একর ভূমি জবরদখল করেছে। এতে তিন গ্রামের ৩৯ পরিবারের জীবন-জীবিকা এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। পার্বত্য চুক্তিতে এসব লিজ বাতিলের বিধান রয়েছে। কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় লিজ হোল্ডাররা অবৈধভাবে ভূমি বেদখল করে চলেছে।

তার মধ্যে অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে বান্দরবানের চিম্বুক পাহাড়ে সেনাবাহিনী কর্তৃক বিলাসবহুল পাঁচ তারকা হোটেল ও বিনোদন পার্ক নির্মাণ। এই প্রকল্পের ফলে ম্রো জনগোষ্ঠীর ১১৬টি গ্রামের প্রায় ১০,০০০ জুম চাষীর জীবন-জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের নামে হাজার হাজার একর জমি সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনোরূপ আলোচনা ছাড়াই অধিগ্রহণের জন্য সশস্ত্র বাহিনী তথা সরকার পক্ষ উদ্যোগ নিয়েছে। ফলশ্রুতিতে জুম্ম অধিবাসীরা নিজ বাস্তভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে এবং তাদের চিরায়ত জুম ভূমি হারিয়ে তাদের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়ছে।

জুম্মদের বাগান-বাগিচা ধ্বংস করে পানছড়ি এলাকায় নির্মাণাধীন সীমান্ত সড়কের একাংশ।

জুম্মদের বাগান-বাগিচা ধ্বংস করে মাটিরাঙ্গা এলাকায় নির্মাণাধীন সীমান্ত সড়কের একাংশ।

সরকার একতরফাভাবে বনায়নের নামে ২,১৮,০০০ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। তন্মধ্যে কেবলমাত্র বান্দরবান জেলায় রয়েছে ৭২,০০০ একর জমি। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে সংখ্যালঘু ও সুযোগ বঞ্চিত খিয়াংসহ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা নিজ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে। বংশপরম্পরায় জুমচাষ ও বসতি করে আসা জমিতে পরবাসী হয়ে পড়েছে।

আরেকটি ধ্বংসাত্মক প্রকল্প হচ্ছে সীমান্ত সড়ক ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। এ প্রকল্পের নাম 'সীমান্ত সড়ক (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পাবত্য জেলা) নির্মাণ প্রকল্প'। এ প্রকল্পের অধীনে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় বাংলাদেশের সাথে মায়ানমার ও ভারতের সীমান্তে ৩১৭ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য সড়ক নির্মাণ করা হবে। এ সড়ক নির্মাণ এবং এ সড়কের সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণের ফলে জুম্মদের শত শত পরিবারের বসতবাড়ি, বাগান-বাগিচা, স্কুল, মন্দির উচ্ছেদ করা হচ্ছে। কিন্তু তাদেরকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়নি। রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক জুম্মদের বসতবাড়ি, বাগান-বাগিচা ও বিভিন্ন স্থাপনা ধ্বংস করে জোরপূর্বক এ ধরনের সংযোগ সড়ক নির্মাণের বিরুদ্ধে গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ক্ষতিপূরণ চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি দিয়েছে বাঘাইছড়ির ক্ষতিগ্রস্ত ৬০ পরিবারের লোকজন।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যেখানে সড়ক নির্মিত হয়েছে, সেখানে মুসলিম সেটেলাররা পৌঁছেছে ও বসতি স্থাপন করেছে। এর ফলে পার্বত্য চুক্তিতে স্বীকৃত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধান হুমকির মধ্যে পড়ছে। আর রাষ্ট্রীয় বাহিনী ও প্রশাসনের সহায়তায় মুসলিম সেটেলাররা জোরপূর্বক জায়গা-জমি দখল করে স্থানীয় জুম্মদেরকে উচ্ছেদ করেছে। অথচ পার্বত্য চুক্তিতে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে জুম্মদের বেহাত হওয়া জায়গা-জমি ফেরত প্রদান এবং অলিখিত চুক্তি অনুসারে মুসলিম সেটেলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসনের বিধান করা হয়েছে। কিন্তু চুক্তির এসব ধারা বাস্তবায়নের পরিবর্তে যেখানেই সড়ক নির্মিত হচ্ছে সেখানে মুসলিম সেটেলার বসতি প্রদান এবং মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ করে দেয়া হচ্ছে। এভাবেই উন্নয়ন কার্যক্রমকে সরকার অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে চলেছে।

সরকার এধরনের আরেকটি ধ্বংসাত্মক প্রকল্প হাতে নিতে যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে গ্যাস-তেল অনুসন্ধান। এলক্ষ্যে বাপেক্স আন্তর্জাতিক কোম্পানীগুলোর কাছ থেকে আগ্রহপত্র আহ্বান করেছে। এতে ছয় কোম্পানি পার্বত্যাঞ্চলে গ্যাস অনুসন্ধানের আগ্রহ দেখিয়েছে। প্রাথমিক বাছাই শেষে চূড়ান্ত তালিকায় স্থান পেয়েছে তিনটি কোম্পানি। তার মধ্যে রয়েছে ভারতীয় তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কোম্পানি ও এনজিসি ভিদেশ লিমিটেড (ওভিএল), রাশিয়ার গ্যাজপ্রম ও চীনা একটি কোম্পানি। এর আগে ২০১১ ও ২০১৫ সালে সরকার পার্বত্য এলাকায় গ্যাস অনুসন্ধানের পুনরায় উদ্যোগ নেয় সরকার। পরে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের আপত্তির মুখে গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ স্থগিত হয়ে যায়।

বস্তুত ভূমি সমস্যা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম প্রধান সমস্যা। তিন পার্বত্য জেলায় ভূমি, নদী, বনজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদসহ বিভিন্ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনজীবনের সাথে সম্পৃক্ত। যেহেতু পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি অদ্যাবধি অমীমাংসিত রয়েছে, সেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ভূমির মালিকানাস্বত্ব যথাযথভাবে পরিচিহ্নিত না হওয়া পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তেল-গ্যাস উত্তোলন ভূমি সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি বিশেষ শাসিত অঞ্চল হিসেব স্বীকৃত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন যথাযথভাবে কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত পার্বত্যাঞ্চলে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের উদ্যোগ পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না বলে বিবেচনা করা যায়। এতে এই এলাকায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় বাড়বে। হুমকিতে পড়বে জীববৈচিত্র্য। পাশাপাশি হাজার হাজার পরিবার উদ্বাস্তু হবে। পাহাড়ে চলমান ভূমি বিরোধকে আরো জটিল করে তুলবে।

আন্তর্জাতিক সংবাদ

ইউএনপিও-এর সাধারণ পরিষদের সভায় জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদল

গত ২৬ মার্চ ও ২৭ মার্চ ২০২২ যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত আনরিপ্রেজেন্টেড নেশন্স এন্ড পিপল্‌স অরগানাইজেশন (ইউএনপিও) এর সাধারণ পরিষদের সভায় পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রীতিবিন্দু চাকমা এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিনিধিদলের পক্ষে মিজ অগাস্টিনা চাকমা ইউএনপিও'র সাধারণ পরিষদের সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা, পার্বত্য চট্টগ্রামের সামরিকায়ন, আন্দোলনকারীদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিতকরণ, ভূমি বেদখল ও মানবাধিকার পরিস্থিতি বিষয়ে একটি প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন।

ইউএনপিও'র ৪৫ সদস্যদের প্রায় ৭০ জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। এই সাধারণ পরিষদের সভার আয়োজক ছিলেন ওয়াশিংটনের ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার সিনেটর পল স্ট্রস-এর নেতৃত্বে ইউএনপিও'র সদস্য 'ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়া'।

সাধারণ পরিষদের সভার শুরুতে ইউএনপিও'র মহাসচিব রাল্ফ বুনচে ইউএনপিও'র কর্মসূচির উপর একটি সাধারণ রূপরেখা উপস্থাপন করেন। এছাড়া তিনি গত বছর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির আন্তর্জাতিক মুখপাত্র ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ানের মৃত্যু এবং জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য আন্তর্জাতিক প্রচারাভিযানের ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য ত্যাগ, সংগ্রাম ও অবদান বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

রাল্ফ বুনচে বলেন, 'আমরা এমন একজনকে হারিয়েছি, যিনি কেবল জুম্ম জনগণের একজন প্রতিনিধি ছিলেন না, সমগ্র প্রতিনিধিত্বহীন ও প্রান্তিক জাতি ও জাতিগোষ্ঠীর মুখপাত্র ছিলেন। তাঁর সংগ্রাম ও অবদান অব্যাহতভাবে অধিকারকামী মানুষের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।'

সাধারণ পরিষদের সভায় গোপন ভোটের মাধ্যমে ইউএনপিও'র একটি ১১ সদস্য বিশিষ্ট প্রেসিডেন্সী গঠন করা হয়। প্রেসিডেন্সীর সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন সোমালিল্যান্ডের এডনা এ্যাডান ইসমাইল। এছাড়া প্রেসিডেন্সীর সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন কাটালোনিয়া থেকে এলিসেন্ডা পলুজি এবং সিন্ধু থেকে রুবিনা গ্রিনউড। প্রেসিডেন্সীর ৮ সদস্যের মধ্যে এশিয়া থেকে তিব্বতের রিগজিন জেনখাঙ এবং খেমার ক্রম-এর এলেক্স থাচ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন।

জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন অগাষ্টিনা চাকমা

ইউএনপিও-এর সাধারণ পরিষদের সভায় জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদল

জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ২১তম অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি অগাষ্টিনা চাকমা (ইন-পার্সন) অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অধিবেশনটি ২৫ এপ্রিল থেকে ৬ মে ২০২২ পর্যন্ত নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদর দফতরে ব্যক্তিগত উপস্থিতি (ইন-পার্সন) এবং অনলাইনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

অধিবেশনের প্রতিপ্রাদ্য বিষয়- 'আদিবাসী জনগণ, ব্যবসা, স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতিসহ মানবাধিকারের যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের নীতি', এবং আদিবাসী ভাষার আন্তর্জাতিক দশক ২০২২-২০৩২ শুরুর সাথে স্থায়ী ফোরামের ২১তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ থেকে জনসংহতি সমিতির প্রীতিবিন্দু চাকমা অনলাইনে এবং বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের চঞ্চনা চাকমা ইন-পার্সন অংশগ্রহণ করেন।

মিজ অগাস্টিনা চাকমা আইটেম-৪: 'আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র, আদিবাসী বিষয়ক বিশ্ব সম্মলনের আউটকাম ডকুমেন্ট এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০-এর প্রেক্ষিতে স্থায়ী ফোরামের ছয়টি এখতিয়ার ক্ষেত্র (অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, সংস্কৃতি, পরিবেশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং মানবাধিকার)' এবং আইটেম ৫: 'আদিবাসীদের সাথে আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের সংলাপ' শীর্ষক এজেন্ডায় বক্তব্য রাখেন।

এছাড়া অগাস্টিনা চাকমা ৫ মে ২০২২ অনুষ্ঠিত স্থায়ী ফোরামের ২১তম অধিবেশনের এজেন্ডা আইটেম ৫(ই): 'আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী এবং মহামারী থেকে মুক্তি লাভ' বিষয়ে এশিয়ার আঞ্চলিক সংলাপেও অংশগ্রহণ করেন। উক্ত এশিয়ার আঞ্চলিক সংলাপে স্থায়ী ফোরামের বিশেষজ্ঞ সদস্য (নেপাল থেকে) ফুলমন চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন এবং ফোরামের অপর সদস্য (চীন থেকে) মিজ ঝাং জিয়াওন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

২৯ এপ্রিল ২০২২ স্থায়ী ফোরামের ২১তম অধিবেশনের 'আদিবাসীদের সাথে আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের সংলাপ'-এর উপর অংশগ্রহণ করে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি প্রীতিবিন্দু চাকমা বলেন, সেনাবাহিনী প্রায়শই সামরিক অভিযান পরিচালনা করে, যার ফলে বিচার-বহির্ভূত হত্যা, নির্বিচারে গ্রেপ্তার, বাড়িঘর তল্লাসি, মানবাধিকার কর্মীদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত (ক্রিমিনালাইজ) করা এবং আদিবাসী নারীর উপর সহিংসতা ইত্যাদি ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে।

এমরিপের অধিবেশনে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি

গত ৪-৮ জুলাই ২০২২ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কর্মব্যবস্থা (এমরিপ)-এর ১৫তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি অগাস্টিনা চাকমা অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের নিটল চাকমাও অংশগ্রহণ করছেন। এমরিপ-এর ১৫তম অধিবেশনে চেয়ার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন এমরিপের বিশেষজ্ঞ সদস্য বিনোতাময় ধামাই (বাংলাদেশ থেকে)।

অধিবেশনে ৬ জুলাই ২০২২ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ও ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ক গ্রুপ ফর ইনডিজেনাস অ্যাফেয়ার্স-এর পক্ষ থেকে 'আইটেম ৮: আদিবাসী নারীদের উপর উন্নয়ন প্রকল্পের প্রভাব সংক্রান্ত প্যানেল আলোচনা' শীর্ষক এজেন্ডায় অংশগ্রহণ করেন জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি অগাস্টিনা চাকমা। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক আগ্রাসী উন্নয়ন প্রকল্প আদিবাসী জুম্ম জনগোষ্ঠীর জাতীয় অস্তিত্বের জন্য ধ্বংসাত্মক।

এছাড়া তিনি ৫ জুলাই ২০২২ 'এজেন্ডা আইটেম ৫: ইন্টারসেশনাল কার্যক্রম এবং প্রতিপাদ্য বিষয়ভিত্তিক গবেষণা ও পরামর্শ' এবং ৭ জুলাই ২০২২ 'এজেন্ডা আইটেম ১০: ভবিষ্যত বিষয় ভিত্তিক গবেষণা সম্পর্কে ফোকাস সহ বিশেষজ্ঞ কর্মব্যবস্থার ভবিষ্যৎ কাজ (আদিবাসীদের সাথে রুদ্ধদ্বার বৈঠক)' শীর্ষক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আহ্বান জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের

গত ১৪-১৮ আগস্ট ২০২২ জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার মিশেল ব্যাচেলেট বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির সরেজমিন তদন্ত করতে বাংলাদেশ সফর করেন। তবে তাঁর সফারকালে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করতে চাইলে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরে অনুমতি প্রদান করেনি।

বাংলাদেশে সরকারি সফর শেষে ১৭ আগস্ট ২০২২ বৈশ্বিক মানবাধিকার প্রধান মিশেল ব্যাচেলেট ঢাকায় এক সম্মেলন আয়োজন করেন। এ সময় তিনি ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্বাধীন পক্ষগুলোর জন্য অবাধ প্রবেশাধিকারের আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, 'আমি সহিংসতা বা জমি জবরদখল থেকে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বিশেষ করে হিন্দু এবং আদিবাসীদের সুরক্ষার জন্য গুরুত্বারোপের ওপর জোর দিয়েছি। ২৫ বছর আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত করা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। কিন্তু মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্রমাগত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি এবং বেসামরিকীকরণের প্রয়োজনীয়তার স্বার্থে, আমি শান্তিচুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং স্বাধীন পক্ষগুলোকে সেই এলাকা পরিদর্শনের জন্য অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছি।'

উল্লেখ্য, সফরকালে মিশেল ব্যাচেলেট নাগরিক সমাজের একদল প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেসময় আদিবাসীদের কয়েকজন প্রতিনিধিও মিশেল ব্যাচেলেটের সাথে দেখা করেন।

> আমি খুলে বলছি। বিভিন্ন জাতিসত্তার কথা যে এখানে স্বীকৃত হয়নি, সে কথা আমি না বলে পারছি না। আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী। আমি সেখানকার উপজাতীয় এলাকার লোক। সেখানকার কোন কথাই এই সংবিধানে নাই। যুগে যুগে ব্রিটিশ শাসন থেকে আরম্ভ করে সবসময় এই এলাকা স্বীকৃত হয়েছিল; অথচ আজকে এই সংবিধানে সেই কথা নাই। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি কীভাবে ভুলে গেলেন আমার দেশের কথা–পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা। এটা আমার বিস্ময়।
>
> *– মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

৩৮তম মৃত্যুবার্ষিকীতে লংগদুর শহীদ বেদীতে ছাত্রছাত্রীদের পুষ্পমাল্য অর্পণ

৩৮তম শাহাদাৎ দিবস উপলক্ষে বাঘাইছড়িতে আয়োজিত স্মরণ সভা

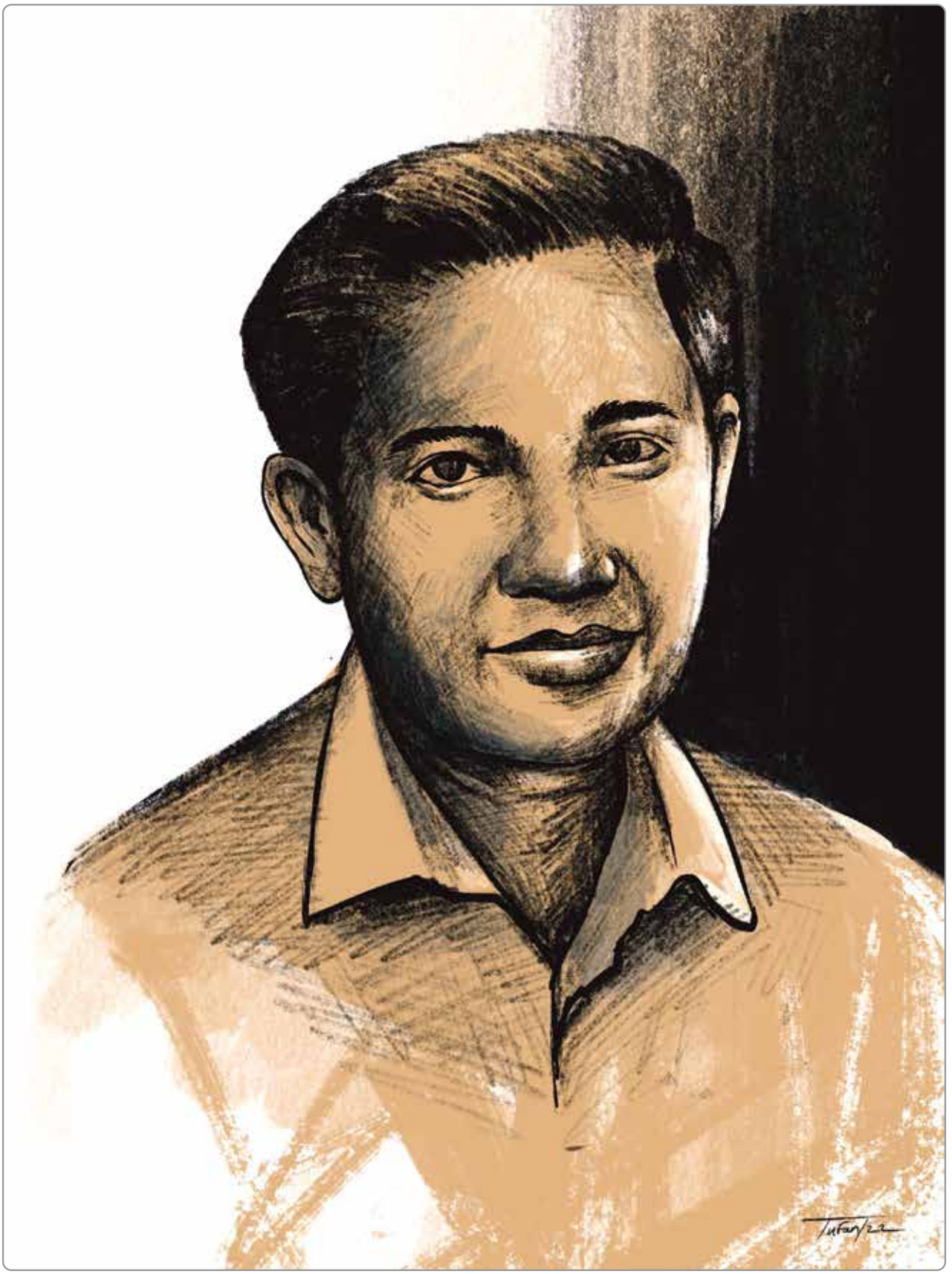

তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত
ফোন: +৮৮-০২৩৩৩৩৭১৯২৭, ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com, ওয়েব: www.pcjss.org